নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খণ্ড ৭

সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

ব্র্যাক

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ

গ্রন্থস্বত্ব : ব্র্যাক

প্রকাশকাল :সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

প্রকাশক : ব্র্যাক, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭৫ মহাখালী
ঢাকা ১২১২

টাইপসেটিং : শাহজাহান বাবুল

মুদ্রণ : ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১২১২

১৯৯৭-এর গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত ১৯টি এবং ১৯৯৮-৯৯-এর ৪টি রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নহেন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষকগণের একান্ত নিজস্ব।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক : **আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী**
সম্পাদক : **হাসান শরীফ আহমেদ**
সদস্য : **সালেহউদ্দীন আহমেদ, আমিনুল আলম, পূরবী দত্ত, কানিজ ফাতেমা, সাদিয়া এ চৌধুরী ও মু. গোলাম সাত্তার**

Nirjash: Summary of selected BRAC research reports of 1997, Number 7, September 1999. Published by the Research and Evaluation Division, BRAC, 75 Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh.

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১

ব্র্যাকের গবেষণা বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা- একটি প্রতিবেদন ৩

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠন বিলুপ্ত হয় যে কারণে ৫

মহিলাদের স্বাধিকার ও সমাজীকিকরণের উপর ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব ৮

পরিবারে খাবার বন্টন ও লিঙ্গবৈষম্য: ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত সদস্য খানার উপর একটি সমীক্ষা ১১

পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দেয় ঋণের কিস্তি পরিশোধের উৎস: একটি সমীক্ষা ১৩

দুঃস্থ মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক সহায়তা কর্মসূচির উপর একটি সমীক্ষা ১৭

ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক পোষ্টারের বিরুদ্ধে মিছিল, প্রতিবাদ ও সমাবেশ ১৯

ভাল থাকা সম্পর্কে গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ২২

গ্রাম সংগঠনে ক্ষুদ্র দলের ভূমিকা ২৬

বাওড় এলাকায় ব্র্যাকের ক্ষুদ্র জেলে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব ২৮

ঋণ কর্মসুচি, ক্ষমতায়ন এবং জন্মনিরোধ: পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব ৩১

স্বাস্থ্য বিষয়ক

পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি ৩৩

শালদুধের পরিবর্তে অন্য তরল খাবার দেয়ার প্রবণতা: মতলব থানার একটি চিত্র ৩৫

ব্র্যাক সদস্য এবং লক্ষীভূত খানার পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা ৩৭

কিশোর-কিশোরীদের যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা: প্রয়োজন উপযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম ৩৯

বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কৃমির প্রাদুর্ভাব ৪৩

পুরুষ ও মহিলাদের রক্তস্বল্পতা নিয়ে একটি সমীক্ষা ৪৫

গ্রামীণ মহিলাদের মাধ্যমে এইড্স বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি: ব্র্যাকের একটি পাইলট প্রকল্প ৪৭

শরীরচিত্র অংকনের মাধ্যমে জন্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে মহিলাদের ধারণা নির্ণয় ৪৯

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্জ্য নিষ্কাশন: একটি পরিবেশগত সমীক্ষা ৫২

ব্র্যাকের উলেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা (১৯৯৮-৯৯)

১৯৯৮-এর বন্যা ও বন্যাকবলিতদের উপর ব্র্যাকের একটি ত্বরিত সমীক্ষা ৫৫

আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি: পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি বেজলাইন জরিপ ৫৭

নতুন বসানো টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ ৬১

কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি ও সংকর প্রজাতির গবাদিপশু এবং মোরগ-মুরগীর টিকার ব্যবহার সংক্রান্ত সমীক্ষা ৬৩

নির্যাসের পূর্ববর্তী খণ্ডসমূহে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ ৬৬

সম্পাদকীয়

ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি আজ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলোর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, ঋণদান, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি অন্যতম। উন্নয়ন কর্মসূচির সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, এর বিকাশ ও মূল্যায়নের জন্য ব্র্যাক গবেষণাকে সম্পৃক্ত করেছে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। ফলে ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ আজ একটি পূর্ণাঙ্গ দক্ষ বিভাগে পরিণত হয়েছে। এ বিভাগ আজ পর্যন্ত প্রায় সাতশত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে যার বেশিরভাগই ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর। এ ছাড়াও দেশেরে স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে জনগুরুত্বপূর্ণ কিছু গবেষণাও পরিচপালনা করেছে এ বিভাগ। সম্পাদিত সকল গবেষণার ফলাফল রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং বনটন করা হয়েছে। এ সকল রিপোর্টের কপি ব্র্যাকের আয়েশা আবেদ লাইব্রেরীতে এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে রয়েছে উৎসাহী পাঠকের জন্য। সকল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীগণ যাতে ব্র্যাকের গবেষণার ফলাফল থেকে লাভবান হতে পারেন এজন্য এ সকল ইংরেজী রিপোর্টগুলোর সার-সংক্ষেপ সহজ ও সাবলীল বাংলায় ধারাবাহিকভাবে নির্যাস-এ প্রকাশের প্রয়াস নেয়া হয়।

এ সংখ্যাটি নির্যাস-এর ৭ম খণ্ড। ১৯৯৭ সালে পরিচালিত গবেষণা রিপোর্টগুলো থেকে বাছাইকৃত কতিপয় রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ এ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও, সমকালীন প্রেক্ষিত ও বিষয়ের গুরুত্বের কারণে পরবর্তী সংখ্যার জন্যে অপেক্ষা না করেই আরও চারটি গবেষণার ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করা হলো এই খণ্ডে। এ চারটি গবেষণা কার্যক্রম হচ্ছে: (১) ১৯৯৮-এর বন্যা কবলিতদের উপর সমীক্ষা; (২) উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য পাবর্ত্য চট্টগ্রামের একটি বেজলাইন সমীক্ষা; (৩) আর্সেনিক দূষণের উপর একটি সমীক্ষা; এবং (৪) গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন ও মোরগ-মুরগীর টিকা সংক্রান্ত সমীক্ষা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশক ধরে সশস্ত্র রাজনৈতিক সহিংসতা চলে আসছিল, ফলে ঐ এলাকায় কোন উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া যায়নি। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এ দাঙ্গার অবসানের ফলে ঐ এলাকায় ব্র্যাকসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান নানাবিধ উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়। উন্নয়ন কর্মসূচির সফল পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার জন্য ও পরবর্তীতে কাঙ্খিত উন্নয়ন কতটা অর্জিত হয়েছে তা দেখার জন্য ঐ এলাকার বর্তমান অবস্থা জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ লক্ষ্যে ব্র্যাক একটি বেজলাইন সমীক্ষা হাতে নেয়। এর কিছু প্রাথমিক ফলাফল এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে।

১৯৯৮ সালে শতাব্দীর দীর্ঘতম ও ভয়াবহতম বন্যা বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ প্লাবিত করেছে। বন্যা কবলিত মানুষের বিপর্যস্ত জীবনের কথা, তাদের সম্পদ ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি, তাদের প্রয়োজন, কিভাবে তাদের পুনর্বাসন করা যায়, ইত্যাদি বিষয়ে কিছু গবেষণা করেছে ব্র্যাক। এ বিষয়েও জানা যাবে একটি সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। ব্র্যাকের ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা অফিসগুলির ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে এ গবেষণা থেকে।

ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ আজ দেশের জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা। এ সমস্যা নিরসনে ব্র্যাক কী অবদান রাখছে তারও কিছুটা জানা যাবে এ সংখ্যা থেকে।

গত বছর ব্র্যাক ও বাংলাদেশ গবাদিপশু গবেষণা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন ও হাঁস-মুরগীর টিকা বিষয়ে দু'টি গবেষণা করেছে যার সার-সংক্ষেপ এ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচির বিভিন্ন কৌশল এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা যাবে। এ ছাড়াও মোরগ-মুরগীর টিকার ব্যবহার ও এর কার্যকারিতা এবং টিকাদানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণগুলো সম্পর্কেও জানা যাবে এ সমীক্ষা দু'টি থেকে।

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এই প্রথমবারের মত ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ে গবেষণার ফলাফল পৌঁছে দেয়ার জন্য চারটি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করেছে। এ কর্মশালাগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে এ বছর ৩ এপ্রিল রাজশাহীতে, ৭ এপ্রিল কুমিল্লায়, ১৫ এপ্রিল ময়মনসিংহে ও ৩ মে ফরিদপুরে। এ চারটি কর্মশালার উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এ সংখ্যায় প্রকাশিক হলো। পূর্ণ প্রতিবেদন ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে পাঠানোর আশা রাখি।

নির্যাস প্রকাশনার পর থেকেই আমরা অব্যাহতভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন কর্মী, গবেষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। তাদের মূল্যবান পরামর্শ নির্যাসের সমৃদ্ধিতে কাজে লাগানোর প্রয়াস চলছে। নির্যাস আপনাদের জন্যই। তাই আপনাদের মতামত আমাদের কাঝে অত্যন্ত মূল্যবান।

নির্যাস সম্পর্কে আপনার মতামত, পরামর্শ ও সমালোচনা আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব।

সম্পাদক।

ব্র্যাকের গবেষণা বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা – একটি প্রতিবেদন

এ কে এম আহসান উলাহ ও জাবীন মোহসীন সংগীতা

ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি আজ বিস্তৃত হয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়। কোন উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করতে হলে নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়। আর ঐ সমস্যার সমাধানের জন্য জানতে হয় সমস্যার উৎসমূল, যেতে হয় সমস্যার গভীরে। এ জন্যই প্রয়োজন হয় গবেষণার। তাই ব্র্যাক গবেষণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সম্পৃক্ত করেছে কর্মসূচির প্রতিটি ক্ষেত্রে। আজ পর্যন্ত ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রায় সাতশত গবেষণা সম্পন্ন করেছে। ব্র্যাক তার গবেষণার ফলাফলগুলোকে সকল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীদের কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী। আর তা বাস্তবায়িত হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনা, সেমিনার, সম্মেলন বা কর্মশালার মাধ্যমে। গবেষণার ফলাফল মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে দেযার অন্যমত প্রয়াস হিসেবে গবেষণা বিভাগ প্রকাশ করছে 'নির্যাস'।

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এ বছর আরো একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। তা হচ্ছে চারটি আঞ্চলিক কর্মশালার মাধ্যমে ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির উপর ১৯৯৮-এ পরিচালিত কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণার ফলাফল ব্র্যাকের আঞ্চলিক ও এলাকা ব্যবস্তাপকদের কাছে সরাসরি তুলে ধরা। এছাড়াও গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের ১৯৯৮-এ সম্পাদিত কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমও তুলে ধরা ছিল এ কর্মশালার অন্যতম উদ্দেশ্য। রাজশাহী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে এ বছর এপ্রিল–মে মাসে এ কর্মশালাগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টার্ক), রাজশাহীতে ৩ এপ্রিল ১৯৯৯। দ্বিতীয় কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় ৭ এপ্রিল ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লায়, তৃতীয়টি ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহে ১৫ এপ্রিল এবং চতুর্থটি হয়েছে ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরিদপুরে মে মাসের ৩ তারিখে। দিনব্যাপী কর্মশালাগুলো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। ব্র্যাক কর্মসূচির উপর আধ ঘন্টার একটি পরিচিতিমূলক ভিডিও প্রদর্শনীর মাধমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

ব্র্যাক গবেষণাকে কর্মসূচি অনুযায়ী মূল চারটি বিষয়ে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়। যেমন: শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পরিবেশ ও অন্যান্য গবেষণা।

প্রতিটি কর্মশালায় গবেষণা বিষয়ক পর্বগুলোর পরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল গবেষণার ফলাফল অবহিতকরণ প্রক্রিয়া বিষয়ক। গবেষণা বিভাগ কিভাবে ব্র্যাকের গবেষণার ফলাফল ব্র্যাকের ভিতরে ও বাহিরে এমনকি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দিচ্ছে তা নিয়েই সাজানো হয়েছিল এ পর্বটি।

রাজশাহীতে ৩ এপ্রিল ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম কর্মশালায় ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ সংক্ষেপে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের ইতিহাস তুলে ধরেন। একটি ছোট পরিসংখ্যান ইউনিট থেকে আজকের এই বিশাল ও পূর্ণাঙ্গ একটি বিভাগে পরিণত হওয়ার পিছনের ইতিহাস অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তিনি উপস্থাপন করেন। অনেক অজানা তথ্য আমরা জানতে পেরেছি।

তিনি বলেন ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কবলিত হয়। তখন ব্র্যাক কুড়িগ্রামের রৌমারীতে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি শুরু করে। কিছু দিন পর এ কর্মসূচি বাধাগ্রস্থ হয়। তখন অক্সফ্যাম-এর জন হেনরি এ কর্মসূচির সার্থকতা দেখার জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। সমীক্ষায় তিনি দেখতে পান যে, কর্মসূচিতে কিছু লোক বাধা প্রদান করছে। গ্রামের শক্তিশালী শ্রেণী রিলিফ সামগ্রী আত্মসাৎ করছে।

আশির দশকে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মীগণ এক কোটি ৩০ লক্ষ গ্রামীণ মহিলাদেরকে মুখে খাওয়ার স্যালাইন তৈরি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দান করে। কিন্তু কিছু দিন পর দেখা গেল যে, এই ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে অনেক ধরনের বাধা বিপত্তি। এ সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য হাতে নেয়া হয় গবেষণা কর্মসূচি। গবেষণা থেকে ঐ সকল সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ জানা যায় এবং তা সমাধানের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ সকল তথ্য নিঃসন্দেহে আমাদের আরো উজ্জীবিত করেছে এবং কর্মপ্রেরণা যুগিয়েছে।

প্রতিটি পর্বেই উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা রাখা এই কর্মশালাগুলোর একটি বিশেষত্ব ছিল। এই পর্বে যে কোন প্রশ্ন, পরামর্শ ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীগণ যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ও সুপারিশ উত্থাপন করেছেন। সকল অংশগ্রহণকারীর মধ্যে একটি স্বতঃস্ফুর্ততা লক্ষ্য করা গেছে। এই চারটি কর্মশালায় মোট ৪১৩ জন ব্র্যাক কর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ব্র্যাকের দু'জন উপ-নির্বাহী পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালকবৃন্দ ও উর্ধতন কর্মকর্তাগণ চারটি কর্মশালায় পর্যায়ক্রমে উপস্থিত ছিলন।

চারটি কর্মশালার মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছেঃ

- গবেষণার কিছু কিছু নতুন ক্ষেত্র বা বিষয় উদ্ভাবিত হয়েছে,
- গবেষণা কর্মী কিংবা গবেষণা বিভাগের উপর মাঠ কর্মীদের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে,
- মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ গবেষণার প্রয়োজন ও গুরুত্বের প্রতি আরো শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন,
- কর্মসূচির সহায়তার জন্যই গবেষণা করা হয় এ বিষয়টি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়েছে,
- কর্মসূচি সংগঠক পর্যায়ে এ কর্মশালা যাতে অনুষ্ঠিত হয় এজন্য অনুরোধ এসেছে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে,
- এ কর্মশালা বিভিন্ন কর্মসূচির কর্মীদের মিলনক্ষেত্র বলে অভিহিত করেছেন অনেকে,
- মত বিনিময়ের অন্যতম উপায় হচ্ছে এ কর্মশালা,
- এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠন বিলুপ্ত হয় যে কারণে*

দিলরুবা বান ও মোঃ নুরুল আমিন

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও দেশের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ দুঃস্থ জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করা ও তাদের বহুমুখী আয়মূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার জন্য ব্র্যাক গ্রাম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ লক্ষ্যে ব্র্যাক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আরডিপি) অন্যতম। এ কর্মসূচির অধীনেই গ্রাম সংগঠন গঠিত হয়, সংগঠনের সদস্যরা প্রশিক্ষণ পায় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে দুঃস্থ জনসাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদেরকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা।

গ্রাম সংগঠনগুলোর কাজ হচ্ছে সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের সহায়তা দান এবং সদস্যদের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদেরকে ঋণ দান করা। ব্র্যাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই গ্রাম সংগঠনগুলিকে এক সময় পৃথক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়া। অথচ বর্তমানে এই গ্রাম সংগঠনগুলোর পরিচালনায় নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে, যেমন সংগঠনের সভায় সদস্যদের অনুপস্থিতি, অনিয়মিত সঞ্চয় ও ঋণ পরিশোধ। এসব বিষয় বিবেচনায় এনে আরডিপি ১৯৯২ সালে গ্রাম সংগঠনের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন আসে। এর মধ্যে গ্রাম সংগঠনের আকার ছোট রাখা, সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার বিষয়ে শিক্ষাদান, ঋণ গ্রহণে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পরিমাণ কমানো, নির্দিষ্ট সময়ে ৮০ শতাংশ গ্রহিতা নিশ্চিতকরণ, নতুন ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আগের ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করা, গ্রুপ ট্রাস্ট ফাণ্ডের ৫০ শতাংশ অর্থ ফেরত দেয়া ইত্যাদি অন্যতম। ১৯৯২ সালে যেসব গ্রাম সংগঠনের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে তার অনেকগুলি ভেঙ্গে দেয়া হয়। ১৯৯৩-'৯৫ সময়কালে পুরুষ গ্রাম সংগঠনের সংখ্যাও কমানো হয়।

১৯৯৬ সালে দ্বিতীয় দফলা পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৯৯৩-৯৪ সালে মূল্যায়নকৃত ১৫০টি গ্রাম সংগঠনের মধ্যে ১৮টি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এরমধ্য থেকে পর্যালোচনার জন্য পাঁচটি অচল গ্রাম সংগঠন বেছে নেয়া হয় যেগুলোতে গত এক বছরে কোন সাপ্তাহিক সভা হয়নি এবং সদস্যরা সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও কিস্তি জমা দেয়নি। দর্শনা, বরুরা, যশোর, ফরিদপুর ও মির্জাপুর এলাকা থেকে উক্ত পাঁচটি গ্রাম সংগঠন নির্বাচন করা হয়।

গ্রাম সংগঠনগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। ঋণ প্রদান ও ব্যবস্থাপনার প্রতি ঋণ গ্রহীতাগণ সন্তুষ্ট নয়। তারা যে পরিমাণ ঋণ পাওয়ার আশা করেছিলো তা তারা পায়নি। তাছাড়াও ঋণ বিনিয়োগ করে যখন লাভ আসতে শুরু করবে তারপর থেকেই শুধু কিস্তি শোধ করা তাদের জন্য সহজ; অথচ তাদের কিস্তি দিতে হচ্ছে ঋণ গ্রহণের পর থেকেই। এ ঋণ বিনিয়োগ হোক আর নাই হোক কিংবা বিনিয়োগে লাভ হোক আর লোকসান হোক তা বিবেচনার মধ্যে আসেনা।

* "Reasons for RDP VO dissolution: a case study of fie selected VOs" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন বিমল গুহ।

তাই ঋণ গ্রহীতাদেরকে ঋণ নেয়ার পরের সপ্তাহ থেকেই মূলধন থেকেই ঋণের কিস্তি দেয়া শুরু করতে হয়। এছাড়া ব্র্যাকের ঋণের পরিমাণ অন্যান্য এনজিও প্রদত্ত ঋণের চেয়ে কম বলে সদস্যরা জানায়। সঞ্চয়ের ব্যাপারেও সদস্যদের আপত্তি রয়েছে। তাদের সঞ্চয়ের উপর ব্র্যাক যে হারে সুদ দেয় তা কম বলে তারা মনে করেন।

কোন কোন গ্রাম সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কাঠামো দূর্বল। কেউ কেউ মনে করেন সকলের মিলিত ভোটে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হওয়া উচিত। ভিজিডি কার্ড বন্টনে শুধু মনোনীত কমিটি কর্তৃক তালিকা না করে সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত বলে অনেক সদস্য মনে করেন।

একটি গ্রাম সংগঠনে সদস্যদের একটি দল ঋণের টাকা দিয়ে ব্র্যাক থেকে পাওয়ার টিলার ক্রয় করে। সদস্যদের অনেকে যথা সময়ে কিস্তি শোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্র্যাক এই পাওয়ার টিলার বিক্রি করে ঋণ আদায় করে। এ উদ্যোগটি সদস্যদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সংগঠন কাঠামো দূর্বল হয়ে এক সময় ভেঙ্গে পড়ে।

অন্য একটি গ্রাম সংগঠন আত্মীয়-স্বজন ও পারিবারিক সদস্যদের নিয়ে গঠিত। সদস্যরা গৃহীত ঋণ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে ব্র্যাক তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থার নিতে পারিনি। কারণ আত্মীয়বেষ্টিত কমিটির অসহযোগিতার কারণে ব্র্যাক উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির রদবদল করতে পারিনি। ফলে সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটেছে।

সর্বোপরি, সদস্যদের হতাশা গ্রাম সংগঠনগুলো ভেঙ্গে যাবার অন্যতম প্রধান কারন হিসেবে দেখা গেছে। ব্র্যাকে যোগদানের পূর্বে তাদেরকে টিউবওয়েল সুবিধা, গৃহ সামগ্রী, সেনিটারী পায়খানা, বিজিডি কার্ড ইত্যাদি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল অথচ পরে আশাহত হয়ে পড়ে।

গ্রাম সংগঠনগুলো প্রধানতঃ পাওয়ার টিলার পরিচালনায় ব্যর্থতা, আত্মীয় পরিবেষ্টিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের অব্যবস্থা, ভিজিডি কার্ড বন্টনে অসন্তোষ, সাংগঠনিক দূর্বলতা, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, এবং সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে এক সময় কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। গ্রাম সংগঠনগুলো শুরুতে খুব আশাব্যঞ্জক ছিলো, ব্র্যাক কর্মীরাও বেশ কর্মতৎপর ছিলেন। কিন্তু পরে তারা ঋণ প্রদান এবং কিস্তি আদায়ের উপরেই গুরুত্ব দেন। অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা অবহেলা করেন, যেমন সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, দলগত ঘনিষ্ঠতা ও একাত্মতা গড়ে তোলার বিষয়ে সদস্যদের দিকে মনোযোগ দেয়া। কোন একক বিষয় এই গ্রাম সংগঠনগুলো ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য দায়ী তা বলা যাবে না। একটি প্রদান কারণকে ঘিরে ছোট-খাট নানা বিষয় নিয়ে অবশেষে সংগঠন অকার্যকর হয়ে পড়ে। এই সব সংগঠনের সদস্যদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে অন্যান্য এনজিওর কর্মসূচিতে যোগদান করেছে।

এই নিষ্ক্রিয় গ্রাম সংগঠনগুলোকে নতুন উদ্যমে চালু করতে হলে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ সংগ্রহের বিষয়টি নতুনভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে যথাযথ হিসাব করে সদস্যদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কর্মীদেরকে এক অফিস থেকে অন্য অফিসে ত্বরিত বদলি না করে হিসাব নিকাশ যথাযথভাবে বুঝে নিয়ে বদলির উদ্যোগ নেয়া দরকার। এই সমস্ত

বিষয় পুনরায় মূল্যায়ন করে অকার্যকর গ্রাম সংগঠনগুলিকে নতুন সদস্যের সমন্বয়ে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে চালু করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

মহিলাদের স্বাধিকার সমাজীকিকরণের উপর ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব[১]

এফ এম কামাল ও আব্দুলাহেল হাদী

দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও নানা সমস্যার মুখোমুখি। এর কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক সংকট। গ্রামীণ এলাকায় এ সমস্যা দেখা দিয়েছে আরও প্রকট আকারে। সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল নেই, শিক্ষক নেই, নেই শিক্ষার উপকরণও। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতের এই সঙ্কট মোকাবেলায় বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাখাত পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

১৯৮৫ সালে মাত্র ২২টি স্কুল নিয়ে ব্র্যাক শুরু করেছিল উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই) কর্মসূচি। বর্তমানে এর আওতায় সারা দেশে ৩৪ হাজারেরও বেশি স্কুল রয়েছে।

ব্র্যাক এর স্কুলগুলোর বিশেষত্ব রয়েছে নানা রকম। যেমন:

- দরিদ্র শিশুরা এসব স্কুলে সহজেই যোগ দিতে পারে,
- অংশীদারী ও উপযোগিতামূলক পাঠ্যসূচি,
- নাচ, গান, গল্প বলা প্রভৃতিসহ পাঠ্যসূচিভুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান, যাতে উন্নত বাচনভঙ্গি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শরীর ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

এ ধরনের স্কুলগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বঞ্চিত, বিশেষতঃ ভূমিহীন পরিবারের মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। স্বচ্ছল অথচ নিরক্ষর এমন পরিবারের শিশুদেরও এসব স্কুলে পড়াশোনায় কোনও বাধা নেই। সহজ, শিক্ষামূলক ও ভীতিহীন শিক্ষা পদ্ধতির কারণে ব্র্যাকের স্কুলগুলো বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। যেসব শিশু আনুষ্ঠানিক স্কুল ছেড়ে চলে যেতো তারা ব্র্যাক স্কুলে অব্যাহতভাবে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারছে। ব্র্যাকের এ কার্যক্রম পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্র্যাকের স্কুলগুলো জনপ্রিয় হয়েছে সেটা সত্য, কিন্তু কার্যকরভাবে এসব স্কুল সমাজ জীবনে কতটুকু প্রভাব রাখচে তাও দেখা দরকার। বিশেষ করে মহিলাদের স্বাধিকার (autonomy) ও সমাজীকিকরণের (socialisation) ক্ষেত্রে এই উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কী অবদান রেখেছে তা তেমন করে খতিয়ে দেখা হয়নি। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে একটি সমীক্ষা চালায় মানিকগঞ্জের ৮৭টি গ্রামে। বিশেষভাবে মহিলাদের স্বাধিকার ও সমাজীকিকরণের উপর ব্র্যাকের উপ-

[1] "Impact of no-formal primary education on women's autonomy and socialization in rural Bangladesh: evidence from BRAC villages" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সায়্যদ কাদির।

আনুষ্ঠানিক স্কুলের প্রভাব নিরুপণ করতে গিয়ে জানা গেছে যে, সরকারি বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তুলনায় ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রভাব অনেক বেশি।

বর্তমান গবেষণায় মহিলাদের স্বাধিকার বলতে বোঝানো হয়েছে যে, বেশ কিছু বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকবে। যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণ, সন্তানের শিক্ষা, সংসারের প্রয়োজনে তেল, সাবান, প্রসাধনী প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়, স্বামীর সঙ্গে আলোচনায় নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার; এবং উলেখিত এই অধিকারের প্রতি স্বামীর স্বীকৃতি। এই পাঁচটি অধিকার-এর মধ্যে কেউ যদি অন্তত: চারটিরও অধিকারী হন তবে তার স্বাধিকার রয়েছে বলে বর্তমান গবেষণায় গণ্য করা হয়েছে।

সমাজীকিকরণ সংজ্ঞায়িত হয়েছে স্বাধিকারের পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে আরও পাঁচটি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। এই অতিরিক্ত বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

- বিয়ের সময় যৌতুক দেয়া,
- স্থানীয় সরকার প্রধানের নাম জানা আছে কিনা,
- উত্তরাধিকার অইন সম্পর্কে কিছু মৌলিক ধারণা,
- তালাকের আইনসংগত পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা, এবং
- দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে সঠিক তথ্য।

স্বাধিকারের পাঁচটিসহ সমাজীকিকরণের ক্ষেত্রে গৃহীত ১০টি বিষয়ের মধ্যে যে সকল অংশগ্রহণকারী অন্তত সাতটিতে ইতবাচক উত্তর দিয়েছেন তাদেরকে সমাজীকিকরণ দক্ষতার অধিকারী বলে গণ্য করা হয়েছে। এই স্বাধিকার ও সমাজীকিকরণের সংজ্ঞাগতভাবে ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকলেও আলোচ্য গবেষণায় উক্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে।

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের মোট ৭৪৪ জন মহিলার কাছ থেকে নেয়া তথ্য বিশেষণ করে জানা যায় যে, মহিলাদের স্বাধিকার ও সমাজীকিকরণের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তুলনায় ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার অবদান অনেক বেশি। গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের জন্য এ শিক্ষা পদ্ধতিই পালন করতে পারে কার্যকর ভূমিকা। এভাবে বাংলাদেশের নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে এই স্বাধিকার ও সমাজীকিকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মূলতঃ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পড়া, লেখা ও গণনার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে থাকে; কিন্তু 'জানার উপায়', 'চিন্তার উপায়' ও 'চর্চার উপায়' এই মৌলিক বিষয়গুলো শিখাতে পারলে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ পরিবর্তনে তা প্রকৃত অর্থে সহায়ক হবে।

এ গবেষণায় আরও জানা যায় যে, ব্র্যাক স্কুল থেকে উত্তীর্ণদের বেশিরভাগেরই বিয়ে হয়েছে সঠিক বয়সে অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সে। এই শিক্ষা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা না রাখলেও এই যে কিছুটা দেরিতে বিয়ে হয়েছে তা সঠিক ভূমিকা রেখেছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে।

নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ও জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলো তেমন কার্যকর হয়েছে এমনটা বলা যাবে না। এছাড়া শিক্ষার্থীর অনুপাতে স্কুলের সংখ্যা যেখানে অনেক কম সেখানে বর্তমান ব্যবস্থায় অতিরিক্ত শিক্ষার্থীদের সংকুলান করা এক অকল্পনীয় ব্যাপার। অর্থনৈতিক কারণে অধিক সংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই বিকল্প ব্যবস্থার কথা জাতীয়ভাবে চিন্তা-ভাবনার সময় এসেছে। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের স্কুলগুলো শুধু নিরক্ষরতা দূর করছে না, মেয়েদের এগিয়ে দিচ্ছে অধিকার অর্জনের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক জীবন যাপনের পথে। এখানেই ব্র্যাকের সফলতা।

পরিবারে খাবার বন্টন ও লিঙ্গবৈষম্য ঃ ব্র্যাক কর্মসূচিভুক্ত সদস্য খানার উপর একটি সমীক্ষা[২]

রীতা দাশ রায়, এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার, মোশ্‌তাক চৌধুরী ও এলেনা এডাম্‌স

বাংলাদেশের সর্বত্র নারী-পুরুষের বৈষম্যের চিত্র দেখা যায়। জন্ম থেকে পরিবারের সকল ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুরা বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে। ছেলে শিশুদের তুলনায় মেয়ে শিশুদের যত্ন-আত্তি কম হয়, তাদের বঞ্চিত করা হয়। ফলে তাদের ভুগতে হয় অপুষ্টিজনিত নানা সমস্যায়। তাই ছেলে শিশুদের তুলনায় মেয়ে শিশুদের মৃত্যুহারও অধিক।

অন্যান্য সম্পদের মতো খাদ্য বন্টন ব্যবস্থায় নানা ধরনের ত্রুটি ও অনিয়ম থাকায় পরিবারে মাথা পিছু খাদ্যের যে প্রাপ্যতা রয়েছে তাতে পরিবারের সকল সদস্যের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা যায় না। বিতরণে বৈষম্যের ফলে অনেক সময় পরিবারে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বন্টিত খাদ্যে তারতম্য দেখা যায়। অনেক দেশের সমাজ জীবনে লিঙ্গ বিত্তিক বৈষম্যের প্রথাগত ভিত্তিও রয়েছে সুদৃঢ়। ইতিপূর্বে মতলব থানায় পরিচালিত এক জরিপে দেখা গিয়েছিল, খাদ্য ছাড়া স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিচর্যার ক্ষেত্রেও রয়েছে একই ধরনের বৈষম্য। এর প্রভাবে পুষ্টিহীনতা ও অকাল মৃত্যুর শিকার হতে হচ্ছে মেয়ে শিশুদের। বস্তুতঃ পুষ্টিহীনতার ফল নারীদের সারা জীবন ভোগ করতে হয়, মেয়েদের দৈহিক গঠনেই শুধু এর প্রতিক্রিয়া ঘটে না, তাদের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাতেও পড়ে সুদূর প্রসারী প্রভাব।

এ পরিস্থিতির আলোকে ব্র্যাক একটি গবেষণা করেছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। এই গবেষণায় ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আরডিপি) সদস্যাদের ভূমিকাও দেখা হেয়েছে। পরিবারে খাদ্য পরিবশনে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে তারা কতখানি সহায়ক হতে পেরেছেন তাও দেখা হয়েছে।

ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি যৌথ গবেষণা প্রকল্পের আওতায় মতলব থানার ১৪টি গ্রামের ১০-১৪ বছর বয়সী ৩৭৬ জন স্কুলগামী শিশুর উপর গবেষণাটি করা হয়। উল্লেখ্য, এই ৩৭৬ জন শিশুর মধ্যে ১৮৮ জন ভাই এবং তাদেরই সমসংখ্যক বোন। এই ভাই-বোন বাচাই করা হয়েছে ৬৩টি ব্র্যাক সদস্য খানা থেকে; বাকি ভাই-বোনদের বাছাই করা হয়েছে ব্র্যাক কর্মসূচির সদস্য নয় এমন ১২৫টি খানা থেকে। এই শিশুদের সবাই তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত এবং এদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ৬.৫ জন।

এসব পরিবারে ২৪ ঘন্টার খাদ্য তালিকায় প্রধানত: থাকে ভাত, ডাল, মাছ ও শাক-সবজি। কখনো কখনো মাংস ও ডিম থাকে। ডাল ছাড়া অন্য খাবারে ভাই-বোন তেমন পার্থক্য করা হয় না। বোনদের তুলনায় ভাইয়ের ডাল খাওয়ার পরিমাণ বেশি।

[২] "Does involvement of women in BRAC influence sex bias in intra-household food distribution"?" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সায়্যাদ কাদরি।

ভালো খাবারের বেলায় বন্টনের যে পার্থক্য দেখা যায় তার নানা রকম কারণও রয়েছে। প্রথমতঃ, পরিবারে খাবার কম থাকলে এ রকম হয়। আবার কোনও বিশেষ খাবার কারও খেতে ভাল লাগে না। খাবারে কম পড়লে মায়েরা দেখেন অন্ততঃ ছেলেদের ভাগে যেন খাবার ততটা কম না হয়। অসুস্থতার কারণেও পরিবারের সদস্যদের কেউ কেউ নিয়মিত খাবার খান না। তবে অসুস্থতার জন্য খাবার না খাওয়ার ঘটনা ভাইদের চেয়ে বোনদের বেলায়ই বেশি ঘটে। দু'জন ভাই এমনও মন্তব্য করেছে যে, "মেয়েদের কম খাওয়াই দরকার"। অন্যদিকে বোনেরা কিন্তু বলেছে ভাইদের বেশি বেশি খাওয়াটা তাদের পছন্দ। এছাড়া বেশি খাবার না পেলে ভাইয়েরা রেগে যায়। ভাইদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট তাকে তো বেশি দিতেই হবে, এ রকম একটা ধারণাও রয়েছে তাদের মধ্যে।

গবেষণায় সকাল, দুপুর ও রাতের খাবার বন্টনে তেমন উল্লেখযোগ্য লিঙ্গবৈষম্যের প্রমাণ মেলেনি। তবে মাংস, মাছ ও দুগ্ধজাত খাবারের বেলায় ছেলে শিশুরা প্রাধান্য পায়। দেখা গেছে বোনদের তুলানায় ভাইয়েরা উন্নত মানের খাবার যেমনঃ মা, মাংস ইত্যাদি খায় অধিক পরিমাণে। তাছাড়া হালকা খাবার যেমন, রুটি, বিস্কুট কিংবা চানাচুর গ্রহণের ক্ষেত্রে ছেলেরা সব সময় বেশি খেয়েছে।

ছেলে শিশুদের প্রতি এই পক্ষপাত বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এক বাস্তবতা। কারণ পরিবারের জন্য যারা উপার্জনকারী তাদের শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ভাল খাবার চাই-এই চিন্তা আমাদের সমাজ জীবনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। তবে ব্র্যাকের কর্মসূচির সঙ্গে সংশিষ্ট সদস্যদের পরিবারে এই ধরনের লিঙ্গবৈষম্য তেমন নেই বলেই আলোচ্য গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে। বরং ব্র্যাকের সদস্য খানায় খাদ্য বিতরণের তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সমতা বজায় রাখা হয়।

পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দেয় ঋণের কিস্তি পরিশোধের উৎসঃ একটি সমীক্ষা[3]

রুখসানা মতিন ও হাবিব রব

গ্রামীণ জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম। গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পরে তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে, সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে, ঋণ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান বাড়াতে সাহায্য করে।

দারিদ্র বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ নিয়ে তারা বিভিন্ন ছোট-খাট ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। কোন কোন বিনিয়োগ থেকে ফল দ্রুত লাভ হয়, আবার কোনটা থেকে হয় বিলম্বে। বিলম্বে অথবা অবিলম্বে যখনই ফল লাভ হোক না কেন, কিস্তি যথাসময়ই পরিশোধ করা হয়। বর্তমান ঋণের কিস্তি দু'সপ্তাহ পরপর পরিশোধ করা হয়। কিন্তু যখন আলোচ্য গবেষণাটি করা হয় তখন ঋণের কিস্তি প্রতি সপ্তাহে শোধ করতে হতো। কাজেই এ গবেষণার ফরাফল সে ভিত্তিতেই আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঋণ গ্রহীতা কোথা থেকে কিংবা কোন উৎস থেকে টাকা যোগাড় করে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে থাকে তা জানার জন্য বর্তমান সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে। যে কাজের জন্য তারা ঋণ নিয়েছেন সে খাতের আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করার কথা। কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় অধিকাংশ ঋণ গ্রহীতা ভিন্ন উৎস থেকে কিস্তি পরিশোধ করে থাকেন। কারণ, যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছিল অনেক সময়ই সে কাজ থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারছে না। যে সকল প্রকল্প তাৎক্ষণিক আয়ের উপযোগী সেগুলোর ক্ষেত্রে একটি সিংহ ভাগ কিস্তি পরিশোধ করা হচ্ছে অন্য উৎস থেকে। পরিবারের মোট সদস্য ও উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যা কত এবং কতদিন থেকে জড়িত ইত্যাদি বিষয়গুলো কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। স্বামীর উপার্জন থেকে অধিকাংশ কিস্তি পরিশোধ হয়ে থাকে। এর কারণ হতে পারে যে, যেখানে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে সেখান থেকে আপাতত: আয় হচ্ছে না কিংবা ঋণের টাকা অন্য খাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ, রংপুর ও নীলফামারী জেলার চারটি গ্রাম সংগঠনের ১৯৫ জনের কাছ থেকে এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের পূর্বের দশ সপ্তাহের কিস্তি কিভাবে পরিশোধ করেছে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, ব্যবসা থেকে আয় কিংবা সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থা কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেনি। যে সকল প্রকল্পের আয় সময়-সাপেক্ষ সে সকল

---

[3] "An investigation into sources of weekly installment payments in RDP" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন ফজলে রাব্বি।

ক্ষেত্রে শতকরা ৮২ জন ঋণ গ্রহীতা অন্য উৎস থেকে কিস্তি পরিশোধ করেছে। যারা রিক্সা কিনেছে তাদের শতকরা ৭৮ ভাগ রিক্সার আয় থেকে কিস্তি পরিশোধ করেছে। আর বাকিরা শোধ করেছে ধার করে, আগের উপার্জন থেকে কিংবা অন্যান্য ঋণ থেকে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে ঋণের কিস্তি শোধ করা হয়েছে উক্ত ব্যবসার আয় থেকে। কিছু ক্ষেত্রে শোধ করেছে স্বামীর আয় থেকে, স্বামীর আয়ের সাথে অন্য আয় মিলিয়ে অথবা অন্যান্য সদস্যদের থেকে। তবে ব্যবসায় মহিলারা বেশি নিয়োজিত হয়নি, ব্যবসা করেছে তাদের স্বামীরা। কারণ গ্রামীণ মহিলারা বাজারে গিয়ে কেনা-বেচনা করবে এটা এখনও স্থানীয় সংস্কৃতি গর্হিত বলে বিবেচনা করা হয়।

ধান ভাঙ্গার ক্ষেত্রে উক্ত আয় থেকে শতকরা ৩৬ ভাগ কিস্তি শোধ করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, লাভ হলেও অধিকতর লাভের আশায় ঋণের টাকা পুনর্বিনিয়োগ করা হয়েছে। ফলে কিস্তির টাকা ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। প্রকল্প থেকে আয় হওয়া শুরু করলে সেখান থেকে কিস্তি পরিশোধ করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। এক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতন সকল সদস্য একই পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। দেখা গেছে, ১-১২ মাসের পুরাতন সদস্য বর্তমান ঋণের আয় থেকে প্রায় ৩৩%, স্বামীর আয়ের সাথে অন্যান্য আয় মিলিয়ে ৪৩%, আয়মূলক প্রকল্প থেকে প্রায় ১৪% এবং সদস্যদের কাছ থেকে ও অন্যান্য আয় থেকে ১০% কিস্তি পরশোধ হয়েছে।

মুরগীর বাচ্চা পালন থেকে আয় আসতে সময় লাগে সাধারণত: দু'মাস। বছরে চার বার মুরগী বিক্রি করে আয় করা যায়। প্রথম দিকে স্বামীরা কিস্তি পরিশোধ করে। মুরগী বিক্রির আয় থেকে কিস্তি পরশোধ করেছে ৪৩% আর বাকিটা স্বামীরাই শোধ করেছে। তরিতরকারীর ক্ষেত্রেও একই রকম চিত্র দেখা যায়। কারণ তরকারী বিক্রির উপযোগী হতে ২/৩ মাস সময় লাগে। এ ক্ষেত্রেও স্বামীর উপার্জন থেকে কিস্তি পরিশোধ হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

গাভী পালন থেকে কিস্তি শোধ হয় মাত্র ৪%। কারণ কম মূলধনে তারা প্রথমে বাচছুর নিকে, যা বড় করতে অনেক সময় লাগে। এক্ষত্রেও কিস্তি পরিশোধের দায় স্বামীদের উপরই বর্তায়। যে সকল সদস্য দু'টো কাজ করেছে যেমন একটাতে টাকা ফেরত আসে দ্রুত এবং অপরটাতে আসে বিলম্বে, এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ কিস্তি পরিশোধ হয়েছে নিজেদের আয় থেকে। সেখানে তুলনামূলকভাবে স্বামীদের সাহায্য কম লেগেছে।

ঋণের পরিমাণ বেশি বা কম হলে কিস্তি পরিশোধের অবস্থা কেমন হবে, এ বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে মতপার্থকা রয়েছে। কেউ মনে করে ঋণ বেশি পেলে কিস্তির অংকও বড় হবে ফলে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করা একটা সমস্যা হয়ে দাড়াবে। আবার কেউ মনে করে যে ঋণের পরিমাণ কম হরে তেমন বেশি আয় হবে না, যা দিয়ে নিয়মিত কিস্তি শোধ করা যাবে।

বড় পরিবারে কিস্তি শোধ করতে অসুবিধা হয় কিনা তা বুঝা যায়নি। হঠাৎ বড় রকমের ঝামেলা বা অসুখ-বিসুখ না হলে ঘটি-বাটি বিক্রি করে কিস্তি শোদ করতে হয় না। অধিকাংশ নতুন সদস্যের কিস্তি স্বামীরাই শোধ করে। অপর দিকে পুরাতন সদস্যরা তাদের ঋণের আয় থেকেই কিস্তি শোধ করছে।

কিস্তি পরিশোধের ধরন

আলোচ্য গবেষণায় একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যে, ব্র্যাকের কড়া নিয়মের কারণে সবাই কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে ভীষণ চাপের মুখে থাকে। যথাসময়ে কিস্তি শোধ না করলে আর ঋণ পাওয়া যাবেনা, এই ধারণাও তাদেরকে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

কোন সদস্য যদি আসলেই কোন কারণে কিস্তি পরিশোধে অপারগ হয়, তখন কোন ক্ষেত্রে প্রথম সপ্তাহের কিস্তির আংশিক শোধ করে। কখনো সমঝোতার মাধ্যমে অপর সদস্যা তাকে সাহায্য করে। সহায়তার হাত প্রথম বাড়ালেও পরবর্তীকালে আর সহানুভূতি প্রদর্শন করে না। বরং অন্য সদস্যগণ জোরপূর্বক থালা বাটি কেড়ে নিয়ে বিক্রি করে কিস্তি শোধের ব্যবস্থা করে।

কিস্তি পরিশোধের কয়েকটি চিত্র

জমিরন

জমিরনের স্বামী রিক্সা ভ্যান চালায়। ছয় বছর আগে জমিরন ব্র্যাকের সদস্য হয়েছে এবং চার বার ঋণ নিয়ে ধান ভানার কাজ করেছে। বাচ্চারে চাল বিক্রির কাজে তার ছেলে তাকে সাহায্য করে। তার মাসিক আয় ৫৫০ টাকা, তা দিয়েই সে কিস্তির টাকা পরিশোধ করে। অন্য একজনকে ধার দেয়ার কারণে দু'কিস্তির টাকা দিতে তার অসুবিধা হয়েছিল। ধারের টাকা সময়মত না পাওয়ায় জমিরন কিস্তির টাকা শোধ করতে পারেনি। ব্র্যাকের কর্মকর্তার কাছে অনেক কান্নাকাটি করেও লাভ হয়নি। বাধ্য হয়ে ঘর বিক্রি করে কিস্তির টাকা শোধ করতে হয়েছে।

সুফিয়া

নিলফামারীর মেয়ে সুফিয়া ঋণ নিয়েছিল, কিন্তু তা কাজে লাগানোর আগেই তার স্বামী মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে সব টাকা নষ্ট করে ফেলে। তারপর কিস্তির টাকাও দেয় না। এখন সে সভায় যেতে পারে না। সদস্যরা সবাই তার উপর রাগান্বিত। কারণ অন্য সদস্যদেরকেই তার কিস্তির টাকা শোধ করতে হবে।

দিলালী

দিলালী রানী তিন সন্তানের মা। আড়াই বছর আগে সে ব্র্যাকের সদস্য হয়েছে। তার স্বামী অসুস্থ হবার আগে আসবাবপত্রের দোকান চালাতো। এখন তাকে অসুস্থ স্বামীর ভরণ-পোষণ ও স্বামীর দোকান দেখাশোনা করত হয়। তরকারির চাষ করবে বলে ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু দুধ বেচে নগদ অর্থ পাওয়া যায় বলে সে গাভী কিনেছে। এখন সে আর বেশি ঋণ নেয় না। কারণ সাপ্তাহিক কিস্তি দেয়া তার জন্য কষ্ট কর হয়ে দাঁড়াবে।

সুপারিশমালা

১ যে কাজের জন্য ঋণ দেয়া হচ্ছে সে কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে ঋণ পরিশোধের শর্ত স্থির করা যেতে পারে,

১ ঋণের আবেদন ভালভাবে খুটিয়ে দেখা ও তদারকির কাজ খুব ঘনিষ্ঠভাবে করা আবশ্যক,

১ ঋণ গ্রহীতাদের লেখা-পড়া ও হিসাব রক্ষণে পারদর্শী করে তোলা দরকার। যাতে তারা সনাতন পদ্ধতির ব্যবসা বা বিনিয়োগের পরিবর্তে উন্নত পরিসরে ও অধিক লেনদেনে সক্ষম হয়, এবং

১ ঋণ গ্রহীতাদের আকস্কিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটা তহবিল গঠন করা আবশ্যক।

দুঃস্থ মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক সহায়তা কর্মসূচির উপর একটি সমীক্ষা[৪]

দিলরুবা আহমেদ

চরম দরিদ্র মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে তাদের আয়ের নিশ্চয়তার উপর। সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের ব্র্যাকের গৃহীত আইজিভিজিডি কর্মসূচি সম্পর্কে পরিচালিত এক গবেষণায় এই ফলাফল পাওয়া গেছে। সমীক্ষায় কর্মসূচি পালন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে ব্র্যাকের কর্মীদের নিষ্ঠার সঙ্গে তত্ত্বাবধানের কাজ পরিচালনার জন্য দেয়া হয়েছে জোর তাগিদ।

দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ছিলেন চরম দরিদ্র তাদের দৈন্যদশা দূর করার লক্ষ্যে ব্র্যাক আইজিভিজিডি কর্মসূচি শুরু করে। অংশগ্রহণকারীদের অবস্থার উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখতে আইজিভিজিডির সঙ্গে ব্র্যাক সমন্বিত করে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিকে।

আইজিভিজিডি কর্মসূচির সাফল্য সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন অনেকেই, সাড়াও মিলেছিল আশাতীত। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি। যেমন, কর্মসূচির ত্যাগ করে চলে গেলেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশগ্রহণকারী। এই পরিস্থিতির কারণে কর্মসূচি ও এর পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মূল্যায়নের প্রয়োজন পরে। এজন্য বেছে নেয়া হয় তিনটি দিকঃ

- এ কর্মসূচি অংশগ্রহণকারীদের পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্তন আনতে পেরেছে কিনা;
- কর্মসূচিতে চরম দরিদ্র মহিলাদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব কতখানি; ও
- এ কর্মসূচি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের নিরোৎসাহের কারণ কী এবং তারা কেন কর্মসূচি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন।

উল্লিখিত তিনটি বিষয় দেখার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ কিশোরগঞ্জ জেলার কিশোরগঞ্জ ও করিমগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল ও ভূয়াপুর থানায় একটি সমীক্ষা চালায় ১৯৯৭ সালের জুন মাসে। এ সমীক্ষার কিছু উল্লেখযোগ্য ফলাফল নিয়েই রচিত হয়েছ এ প্রবন্ধ।

পারিবারিক জীবনে প্রভাবঃ আইজিভিজিডি কর্মসূচি অংশগ্রহণকারী মহিলাদের পরিবারে নানা ধরনের পরিবর্তন এনেছে বলে জানা গেছে। মোরগ-মুরগী পালন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সকলেই (৯২%) প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তবে ঋণ সহায়তা পেয়েছেন সকলেই। এই ঋণ মোরগ-মুরগী পালন ছাড়া অন্যান্য আয়মূলক কাজে বিনিয়োগ করেছেন তারা। বছর খানেক পর তারা ক্ষুদ্র ব্যবসা ও গবাদি পশু পালনের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন, কারণ তাদের বসতবাড়ির ছোট আঙ্গিনায় মোরগ-মুরগী পালনের কাজে প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়। এই আয় উপার্জনের ফলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগেছে, সমাজে তাদের

---

[4] "Poverty alleviation of the hard-core poor in Bangladesh: a study on BRAC's income generation for vulnerable group development programme" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সায়্যাদ কাদির।

মর্যাদাও বেড়েছে। তবে মহিলাপ্রধান খানায় যেখানে দ্বিতীয় কোনও উপার্জনক্ষম সদস্য নেই, সেখানে আর্থিক দুরবস্থা ঘোচেনি একেবারে।

চরম দরিদ্রের প্রতিনিধিত্বঃ বছরে যাদের আয় জনপ্রতি ৫,২৮৯ টাকার কম তাদেরকে চরম দরিদ্র বলা হয়। সেদিক থেকে আইজিভিজিডি কর্মসূচির সদস্য পরিবারগুলো চরম দরিদ্র। কারণ তাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বছরে গড়ে ৪,৬৬৩ টাকা। তবে ভূমির পরিমাণ দারিদ্র নিরুপণের অন্যতম মাপকাঠি। বর্তমান গবেষনায় গড়ে ১০ শতাংশ অথবা তার কম ভূমির অধিকারী পরিবারকে চরম দরিদ্র পরিবার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই হিসেবে অংশগ্রণকারীদের অর্ধেকের বেশি (৫৮%) চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছেন। তবে মোরগ-মুরগী পালন কর্মসূচিতে যোগদানের ফলে অংশগ্রহণকারীদের ভূমির পরিমাণ দাড়িয়েছে ১৯ শতাংশ।

কর্মসূচি ত্যাগের প্রেক্ষাপটঃ গবেষণায় দেখা গেছে মোরগ-মুরগী পালন কর্মসূচি থেকে স্বেচ্ছায় চলে গেছেন শতকরা ৬২ জন সদস্য, অন্যান্যদের (৩৮%) ব্র্যাক কর্মীরা কর্মসূচিচ্যুত করেছেন। স্বেচ্ছাচ্যুতরা তাদের কর্মসূচি ত্যাগের কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলোর মধ্যে মুখ্য কারণ হচেছঃ আইজিভিজিডি কর্মসূচির কর্মীদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের অভাব এবং অবাঞ্চিত আচরণ, সাংসারিক কাজের চাপ, ঋণের কিস্তি প্রদানে সমস্যা, গ্রাম সংগঠন থেকে দূরে অবস্থান এবং উক্ত সংগঠনের দলপতির দুর্ব্যবহার।

আইজিভিজিডি কর্মসূচির স্টাফদের দ্বারা কর্মসূচিচ্যুত করার মুখ্য কারণ হচ্ছে ঋণের কিস্তি প্রদানে অনিয়ম ও গ্রাম সংগঠনের বিলুপ্তি।

এ গবেষণা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আশানুরূপ কাজ না হলেও এই কর্মসূচি গ্রামের চরম দরিদ্র মহিলাদের জন্য এক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই সুযোগটিকে আরো বাড়ানো প্রয়োজন। তাহলেই অংশগ্রহণকারী মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে এক সুনিশ্চিত আয়মূলক উৎস গড়ে তোলা যাবে। ব্র্যাক কর্মীদের তদারকির কাজে আরও ঘনিষ্ঠ হতে হবে।

ঋণের কিস্তি পরিশোধের বিষয়টিকে আনতে হবে বিশেষ বিবেচনায়। প্রয়োজনের পরিশোধের নিয়মগুলোকে যথাসম্ভব নমনীয় করতে হবে। তারপরও সদস্যদের কর্মসূচি ত্যাগের প্রবণতা যাতে হ্রাস পায় সেদিকে মনোযোগী থাকতে হবে। কর্মীদের দিতে হবে নিশ্চয়তা। পাশাপাশি কর্মীদের ব্যবহার হতে হবে সদিচ্ছাপূর্ণ। কর্মসূচির কাজ জোরদার করে তোলার পাশাপাশি সদস্যদের সঙ্গে চলনে বলনে হতে হবে সহমর্মী ও সহৃদ।

ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক পোস্টারের বিরুদ্ধে মিছিল, প্রতিবাদ ও সমাবেশ[৫]

মোঃ রাফি ও শাহ্ আসাদ আহমেদ

১৯৯৭ সালের গোড়ার দিকে ব্র্যাক সারা বাংলাদেশে সাত ধরনের প্রায় সাত লক্ষ সচিত্র পোস্টারের মাধ্যমে কিছু মুসলিম পরিবারিক আইন তুলে ধরে। আইন অমান্যকারীর শাস্তি কিরূপ হবে পারে পোস্টারগুলোর মাধ্যমে তাও তুলে ধরা হয়।

পোস্টারগুলো বিভিন্ন স্কুলে, বাজারে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দেয়ালসহ এমন জায়গায় লাগানো হয় যেখানে অনেক লোকের সমাগম হয় এবং সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় পোস্টারগুলো লাগানো কয়েক দিনের মধ্যেই এগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় মিছিল, সমাবেশ ও প্রতিবাদ শুরু হয়, এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পোস্টারগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। বেশিরভাগ স্থানেই পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং কোথাও কোথাও কাদা কিংবা গোবর ছিটিয়ে পোস্টারগুলোকে অস্পষ্ট করে দেয়া হয়।

এছাড়াও কিছু এলাকায় যেমন, পুঠিয়া, সরাইল ও কাঁচিকাটার ব্র্যাক অফিসের দেয়ালে লাগানো পোস্টারগুলোকে খুলে ফেলতে বাধ্য করা হয়। কিছু ব্র্যাক কর্মী গালিগালাজ ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

পোস্টারের বিরুদ্ধে যেসমস্ত যুক্তি ও কারণ প্রতিবাদকারীগণ তুলে ধরেন তার মধ্যে অন্যতম হল যে, পোস্টারগুলো ইসলামী শরীয়া আইন বিরোধী। উদাহরণস্বরূপ, "মুখে মুখে তালাক দেয়া যাবে না" কিংবা "বিয়ে রেজিস্ট্রি করা আবশ্যক" এসব শরীয়া আইনের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। প্রতিবাদকারীগণের যুক্তি হল মুখে মুখে তিনবার তালাক শব্দ উচ্চারণ করলেই তালাক হবে এবং তালাক হওয়ার পর সেই স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা নাজায়েজ। এই তালাকের পরও যদি কেউ সহবাসে লিপ্ত হয় তবে সেই সহবাসজাত সন্তান জারজ হবে। বিয়ে রেজিস্ট্রি সম্পর্কে বড় যে যুক্তি তারা দেখিয়েছেন তা হল যে, এ যাবৎ যত বিয়ে রেজিস্ট্রি ছাড়া হয়েছে তা কি অবৈধ না বাতিল? তাছাড়া মুসলমানের বিয়ে কলেমার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু পোস্টারে যেভাবে লিখা হয়েছে "কলেমা পইড়া বিয়া হইছে রেজিস্ট্রি করি নাই" এতে করে কলেমাকে উপহাস করা হয়েছে। অন্ততঃ তারা পোস্টারের এই ছন্দময় তথ্য পড়তে গিয়ে তাই মনে করেছেন। অণ্য পোস্টার সম্পর্কেও প্রতিবাদকারীগণ তাদের মতামত তুলে ধরেন।

"আমরা এই পৃথিবী এবং সভ্যতা নির্মাণ করেছি; পুরুষ এবং নারী সমভাবে তা নির্মাণে অবদান রেখেছে" – এই পোস্টার সম্পর্কে প্রতিবাদকারীগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে ইসলাম নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাস করে তবে নারীর জন্য যে কাজ নির্ধারিত তা পুরুষের জন্য নয়। পোস্টারে বর্ণিত চিত্রমালা তুলে ধরেছিল যে পুরুষ এবং নারী মাটি কাটছে এবং উভয়ই তা মাথায় বহন করছে যা ইসলাম বিরোধী। তাদের যুক্তি হল, মেয়েরা এত ভারী কাজ এবং বাড়ির বাহিরে পুরুষের সংগে কাজ করবে তা

---

[5] "Backlash against posters of BRAC human rights and legal education programme" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন শাহ আসাদ আহমেদ।

ঠিক নয় অর্থাৎ পাপ। তারা আরও মনে করেন যে, এজন্যই সমাজে এত অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে শুধুমাত্র মেয়েরা চলনে বলনে বেপর্দা বলে।

তারা আরও বলেন যে, ব্র্যাক তার কর্মসূচির মাধ্যমে মেয়েদেরকে বাড়ি থেকে বাহিরে এসে কাজ করতে উৎসাহিত করেছে। এছাড়াও ব্র্যাক শুধুমাত্র মেয়েদেরকে কাজ দিচ্ছে, ঋণ দিচ্ছে। অপরদিকে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র এবং বেকার পুরুষদের জন্য কিছু করছে না। এই দরিদ্র এবং বেকার যুবকরাই হতাশ হয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। অপর একটি পোস্টারে যে সচিত্র তথ্য তুলে ধরা হয়েছিল তা এরকম: "বাল্য বিবাহের কারণে বধুগণ কাঁদছে; কেঁদে ভাসালেও তাদের অশ্রুপানে কেউ তাকায় না।" যারা এই পোস্টারের প্রতিবাদ করেছেন তাদের মতে দরিদ্র অকর্মন্য পিতা তার মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন যদি সক্ষম জামাই পান। এছাড়াও বাল্য বিবাহ যে জায়েজ তার একটি উদাহরণ হল আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) স্ত্রীগণের একজন বিবাহকালে মাত্র ৬ বৎসর বয়সী ছিলেন।

নারী নির্যাতন যে অন্যায় এবং অপরাধ এই পোস্টারটি সম্পর্কে প্রতিবাদকারীগণ বলেছেন যে, এটা ঠিক যে ইসলাম ধর্ম মহিলাদের উপর নির্যাতন পছন্দ করেনা। মহিলাদের মারধর করা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। তবে তারা এটাও বলেছেন যে, যেভাবে নির্যাতিত মহিলাকে পোস্টারে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা আপত্তিকর। মহিলাকে বেশ নগ্ন দেখাচ্ছে বরং তার শরীর আরেকটু ঢেকে দেয়া যেত।

পোস্টারের বিরুদ্ধে কেন এই প্রতিবাদ

পোস্টারের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন তারা মূলত: কিছু ইসলামী রাজনৈতিক দলের সদস্য। তারা তাদের দলের আদর্শ ও নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত এসব প্রতিবাদ সমাবেশে বেশ সফলতার সাথে সংগঠিত ও একত্রিত করেছিলেন স্থানীয় মাদ্রাসার ছাত্র, ইমাম এবং সমভাবাপন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পোস্টারগুলো এক শ্রেণীর পেশাজীবীর রুটি-রুজির প্রতি হুমকিস্বরূপ। এই পেশাজীবীরা টাকা-পয়সার বিনিময়ে গ্রামে সালিশের মাধ্যমে হিলা নিকাহ ব্যতিত তালাকপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীর পুন:র্মিলন ঘটানোর অনুমতি দেয়। এই পোস্টারগুলো বেশি প্রচার পেলে সমাজে তাদের গুরুত্ব কমে যাবে এবং এ জাতীয় কর্মকাণ্ড ঘটাতে পারবে না। সচিত্র তথ্য নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির দরুন একেক শ্রেণীর লোক একেকভাবে পোস্টারগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, যারা পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং পোস্টার কর্মসূচিরও সমালোচনা করেছিলেন তারা পবিত্র কোরান ও হাদীসের আলোকে পোস্টারগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। অপর দিকে ব্র্যাকের কর্মী এবং সমিতির সদস্যরা পোস্টারগুলোকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা ও সমস্যার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

পোস্টার একটি কার্যকরী গণমাধ্যম। বিশেষ করে সচিত্র পোস্টারের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে অল্প খরচে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছে দেয়া সম্ভব। পোস্টারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ, মিছিল ও সমাবেশ হলেও, পোস্টারের পক্ষে ঐ একই স্থানে সমর্থকও ছিল। ব্র্যাক সমিতির সদস্যগণ পোস্টারের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। পোস্টারের সমর্থকগণ মনে করেন যে, বিপুল সংখ্যক পোস্টার বিভিন্ন স্থানে লাগনো উচিত। এই গবেষণার ফলাফলেও প্রতীয়মান হয় যে, ব্র্যাকের পোস্টার নীতি ঠিকই আছে তবে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা যেতে পারে। যেমন, যেসব চিত্র এবং তথ্য ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি

করেছে তা সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। মানবাধিকার ও আইন কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলী ঠিক রেখে সঙ্গতিপূর্ণ সংশোধন বার বার করা যেতে পারে। কোনো পোস্টারের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হলে আপত্তির বিষয় সম্পর্কে জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরামর্শ হল যে, প্রথমে অল্প সংখ্যক পোস্টার তৈরি করে লাগাতে হবে এবং দেখতে হবে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। এর ভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক পোস্টার দেশের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো যেতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, পোস্টারগুলো সাধারণ কাগজের তৈরি বলে বেশি দিন টিকে না। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। তাই কাগজের বদলে টিন অথবা বিলবোর্ডের আকারে তৈরি করা যেতে পারে। পোস্টার কর্মসূচির সফলতা নির্ভর করছে সমাজের বেশিরভাগ মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার উপর। বেশিরভাগ জনগণের নিকট পোস্টারগুলোর আবেদন বা গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে এটাই বুঝে নিতি হবে যে তা সমাজের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং সে ক্ষেত্রে ব্র্যাকের কর্মসূচির জন্য পোস্টার এক অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

ভাল থাকা সম্পর্কে গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি[৬]

আমিনা মাহবুব ও রীতা দাশ রায়

'ভাল থাকা' বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে নানা জনের নানা মত থাকাই স্বাভাবিক। পরিস্থিতি অনুসারে অবশ্য এসব মত গড়ে ওঠে, আবার তা বদলেও যায়। কিন্তু 'ভাল থাকা' এবং 'ভাল না থাকা' সম্পর্কে জনসাধারণের যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা এক স্বীকৃত সত্য হলেও এ বিষয়ে গবেষণা প্রয়াসের উদাহরণ তেমন নেই; অথচ জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়াসের উদাহরণ তেমন নেই; অথচ জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট। কারন বেশিরভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনচেতনার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন।

গ্রাম বাংলার পরিবার ও ব্যক্তির জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা যেখানে উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মূখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে ভাল থাকা এবং না থাকা সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি সনাক্ত করা এক অপরিহার্য কর্তব্য। এই লক্ষ্যে ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি-র যৌথ গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭-এ পরিচালিত হয়েছে আলোচ্য গবেষণাটি। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের চিন্তা ভাবনায় 'ভাল থাকা'র বৈশিষ্ট্যগুলো কী এবং 'ভাল থাকা'র উপায় কী সে সব চিহ্নিত করা। পাশাপাশি কেন ভাল থাকা যায় না তার উত্তরও খোঁজা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে মতলব থানার বেরাদিয়া ইউনিয়নের চরনিলক্ষী গ্রামে। এই গ্রামে ১২৩টি খানা আছে এবং লোকসংখ্যা ৭৪৯ জন।

গবেষণালব্ধ ফলাফল দেখা গেছে, ভাল থাকা সম্পর্কে গ্রামবাসীদের মধ্যে নানা রকম ধ্যান-ধারণা রয়েছে। লিঙ্গ ও শ্রেণীগত বিচারে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও কয়েকটি বিষয়ে তাদের মনোভাবে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। তারা মনে করেন আর্থিক স্বচ্ছলতা, সুস্বাস্থ্য, এবং পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক এই তিনটি বিষয়ই 'ভাল থাকা'র মূল কথা। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে ভাল থাকা যায় না। তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টিই রয়েছে সব কিছুর মূলে।

সবচেয়ে ভাল থাকা

ভাল থাকার নানা মাত্রা আছে। পরিবারে সবচেয়ে ভাল অবস্থা কি হতে পারে সে সম্পর্কে গবেষণায় কিছু শর্ত পাওয়া গেছে। যেমন:

- পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থা (এসএসসি থেকে স্নাতক পর্যন্ত),

[৬] "An emic towards well-being" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সায়্যাদ কাদির।

- ভূমির অধিকারী হওয়া (৩২০ ডেসিমেল থেকে ৪৮০ ডেসিমেল পর্যন্ত),
- স্থায়ী উপার্জন/সরকারী চাকরি থাকা,
- পুত্র সন্তানদের চাকুরে হওয়া,
- ঘরে আরও বেশি নগদ অর্থ থাকা,
- সন্তানদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থাকা,
- বাড়ির সঙ্গে পুকুর থাকা,
- টিনের পাকা ঘর, ঘরে কয়েকটি কামরা থাকা,
- গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী থাকা,
- বছর শেষে উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকা,
- পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ থাকা,
- নিজেদের কৃষিকাজ বা কায়িক শ্রম না করা, কাজ করে দিবে দিন-মজুরেরা,
- সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ,
- পরিবারে ঝগড়া-ঝাটি কম থাকা,
- সংসার চালানো নিয়ে দুর্ভাবনা থাকবে না, ও
- কৃষিঋণ পাওয়ার সুবিধা।

সাধারণ ভাল থাকা

সাধারণ ভাল অবস্থার নির্ধারক সম্পর্কে গবেষণায় নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ পাওয়া গেছেঃ

- ভূমির মালিকানা (৮০ ডেসিমেল থেকে ১৬০ ডেসিমেল পর্যন্ত),
- সারা বছরে খোরাকি আছে এবং কিছু উদ্বৃত্ত আছে,
- নিজস্ব উৎস থেকে পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা,
- পাকা বাড়ি, তবে সব কামরায় টিনের চাল নয়,
- নিজের জমিতে নিজের চাষাবাদের ব্যবস্থা,
- গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী থাকা,
- ধার-কর্জ করে সংসার চালাতে হয় না,
- আর্থিক সহায়তা নেয়ার প্রয়োজন নেই এবং ঋণ দেয়ার ক্ষমতাও নেই,
- পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা এসএসসি পর্যন্ত,
- সন্তানদের একটি পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে, এবং
- সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ আছে।

কম ভাল থাকা

ভাল থাকা ও না থাকার মাঝামাঝি অবস্থা সম্পর্কে গবেষণায় তথ্য মিলেছে এ রকমঃ

- ভূমি (৪০ ডেসিমেল থেকে ৮০ ডেসিমেল),
- বর্গা চাষ ও জমি বন্ধক দেয়ার উপর নির্ভরতা,

- ছয় মাসের খোরাকি থাকা এবং একই সাথে রিক্সাচালক, খেয়ামাঝি, জেলে বা দিনমজুর হওয়া,
- পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা,
- খড়ের চালের ঘর-বাড়ি,
- কয়েকটি মাত্র গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী থাকা,
- পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহে অসমর্থ,
- বিরতিহীন কায়িক শ্রমে স্বাস্থ্যহানি, এবং একটি পর্যায় পর্যন্ত চিকিৎসা।

কোনও রকমে থাকা

গবেষনায় কোন রকমে থাকা সম্পর্কে নিম্নলিখিত চিত্র পাওয়া গেছে ঃ

- জমি নেই,
- রিক্সাচালক, মাঝি, দিনমজুর বা জেলে জীবন,
- পাটখড়ির বেড়া দেয়া জীর্ণ ঘর-বাড়ি,
- কোনো রকমে তিন বেলা খাবার,
- ভগ্নস্বাস্থ্য, কোন চিকিৎসা নেই,
- বিনা চিকিৎসায় সন্তানের মৃত্যু,
- আত্মসম্মানের জন্য কারও কাছে হাত পারতে না পারা,
- ঋণ দিয়ে কঠোর শ্রম দিয়ে পরিশোধ, এবং
- কয়েকটি হাঁস-মুরগী এবং ভাগে গবাদি পশু পালন।

খুবই কষ্টে থাকা

গবেষণার এই অংশের জন্য তথ্য দিয়েছেন গ্রামের নারীরা। তাদের বর্ণনায় যে অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়, তা হল ঃ

- দিনে এনে দিনে খাওয়া,
- স্বামী মৃত অথচ উপার্জনক্ষম সানালক পুত্র নেই,
- ভাঙ্গা পাটখড়ির ঘর,
- তিন বেলা খাবার অনিশ্চিত,
- অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে, চিকিৎসা নেই,
- সন্তানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা,
- ঋণ মেলে না, ও
- চেয়ে চিন্তে চলতে হয়।

ব্র্যাকের এই আলোচ্য গবেষণার মধ্য দিয়ে জীবনের বাস্তবতার এক চিত্র মিলেছে, সেই সঙ্গে মিলেছে এর নেপথ্যের দৃশ্যটিও।

ভাল থাকার ভিত্তি হিসেবে গ্রামের পুরুষরা গুরুত্ব দেন নিজের শিক্ষাকে। স্বশিক্ষার সূত্রে যে কাজ পাওয়া যায় তাতে হয় আয়-উপার্জন। ফলে জমি-জমা, কৃষি সরঞ্জাম, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর মালিক হওয়ার পাশাপাশি পাওয়া যায় ভাল বউ। চাষবাসের আয় থেকে আসে আসবাবপত্র, পাকা বাড়ি-ঘর, পরিবারে শান্তি ও সম্প্রীতি, চিকিৎসা সুযোগ, ভাল জামা-কাপড় আয় আর ভাল খাবার। ভাল খাবার দেয় ভাল স্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্য ভাল থাকলে কঠোর পরিশ্রম করতে অসুবিধা হয় না।

এই হলো গ্রামের মানুষের চিন্তা-চেতনায় ভাল থাকা জীবনের ছবি। আর ভাল না থাকাজীবনের ছবিটিও দেখা গেছে গবেষণায় সেই ছবি এ রকম; আয়ের উৎস নেই, রিক্সা বা নৌকা নেই, জমি-জমা, টাকা-পয়সা নেই। তাই অসুখ হলে চিকিৎসা নেই। দু'বেলা খাবারও জোটে না। অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। ঘরে শান্তি নেই, সমাজে মান-মর্যাদা নেই।

ভালো থাকতে হলে মানুষকে অনেকগুলো বাধা অতিক্রম করতে হয়। তাই গ্রামবাসীরা মনে করে, আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে যুক্ত হওয়া, সংসারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে টাকা উপার্জন করা, ছোট পরিবার থাকা, পরিবারের স্বচ্ছলতা পাশাপাশি বাচ্চাদের শিক্ষার নিশ্চয়তা, সময়মতো ঋণ পাওয়া, ব্র্যাকের সদস্য হওয়া, ইত্যাদি বিষয়ের নিশ্চয়তা থাকলে ভালো থাকার বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।

উপসংহারে বলা যায়, গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যগুলো উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমাদের ধারণা। খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আরও পর্যালোচনা করলে খুঁজে পাওয়া যাবে ভাল থাকার উপায়। উন্নয়ন কার্যক্রম কোন পথে এগোলে সাফল্য পাবে তারও দিক নির্দেশনা মিলবে।

গ্রাম সংগঠনে ক্ষুদ্র দলের ভূমিকা[৭]

মোঃ রাফি, শাহ আসাদ আহমেদ, এস এম আলমগীর হোসেইন, মোঃ ফজলুল হক ও তপন কুমার দাশ

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যক্রম গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই গ্রাম সংগঠনসমূহের উদ্দেশ্য এবং এর সদস্যরা কী কাজ করবে বা কিভাবে কবে তাও ঠিক করে দিয়েছিল ব্র্যাক। সংগঠনের কাজগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে তা সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়। ক্ষুদ্র দল গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাম সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র দলগুলো নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে গ্রাম সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

গ্রাম সংগঠনের সাফল্যে ক্ষুদ্র দলের ভূমিকা কী তা দেখার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং মনিটরিং বিভাগ যৌথভাবে একটি সমীক্ষা চালায়। গবেষণার জন্য ২৩৯টি গ্রাম সংগঠন থেকে তথ্য নেয়া হয়। এ গবষেণায় যে সংগঠনগুলো ১৯৮৬-৯৬ এর মধ্যে গঠিত হয়েছিল এবং বর্তমানে সক্রিয় সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার এই সংগঠনগুলো থেকেই ক্ষুদ্র দল বাছাই করা হয়। প্রতিটি ক্ষুদ্র দল থেকে তিন জন করে সদস্য তথ্য প্রদান করে।

মোট ২৩৯টি সংগঠনের মধ্যে শতকরা ৪২টিতেই ক্ষুদ্র দলের অস্তিত্ব ছিল। ক্ষুদ্র দল ছিলনা এমন সংগঠনের সফলতা ক্ষুদ্র দল ছিল এমন সংগঠনের তুলনায় কম। কারণ হল, সংগঠনগুলো পরিচালনায় ক্ষুদ্র দলগুলো ব্র্যাকের কর্মীদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। এছাড়াও সংগঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও ক্ষুদ্র দলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

ক্ষুদ্র দলের সকল দায়িত্ব বা প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সদস্যরা পুরোপুরি জ্ঞাত ছিল না। গড়ে ৫টি দায়িত্ব সম্বন্ধে তারা সঠিকভাবে বলতে পেরেছে। নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে ক্ষুদ্র দল তৎপর ছিল। ফলে কার্যাবলী পালন ও উদ্দেশ্য অর্জন অনেকাংশেই সফল হয়। গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে অন্তরঙ্গতা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়, যা প্রয়োজনে বেশ কাজে লাগে। উদাহরণস্বরূপ কোন সদস্য সময় মতো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে অন্যেরা এগিয়ে আসেন কিস্তি পরিশোধে সাহায্য করার জন্য।

ক্ষুদ্র দলের দায়িত্ব পালন ও গ্রাম সংগঠনের সফলতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্ষুদ্র দল তার দায়িত্ব পালনে কার্যকরভাবে অবদান রেখেছে। তারা গ্রাম সংগঠনে কর্মচারীদের সফলভাবে সভা অনুষ্ঠানে সহায়তা করেছে। তাদের সভায় দলগতভাবে বসার জন্য সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়েছে। ক্ষুদ্র দলের সাপ্তাহিক হাজিরা নিশ্চিতকরণ গ্রাম সংগঠনের কৃতিত্ব অর্জনে ৮২% অবদান রেখেছে।

---

[7] "Small group and performance of village organizations in rural development programme of BRAC" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এইচ আর তালুকদার।

দায়িত্ব পালন ও ক্ষুদ্র দলের নিয়ম-কানুন অনুসরণে বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন, একজন সদস্য অন্য জনের বাড়িতে যায় তাকে সভায় নিয়ে যাবার জন্য। সেখানে কোন সদস্য সবায় যেতে অনীহা প্রকাশ করলে সাক্ষাৎপ্রার্থী তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং অনুপস্থিতির অবাঞ্ছিত দিকগুলো তুলে ধরেন। যেমন, ঋণ পাবার ব্যাপারে অসুবিধা ব্যাখ্যা করে, তার মেঝের ধান বালতি অথবা কোন পাত্রে তুলে দিয়ে বা অসুখ হয়ে থাকলে বাজার থেকে ঔষধ কিনে তার মন জয় করার চেষ্টা করেন। দলপতি বিষয়ভিত্তিক সভার গুরুত্ব, কিস্তির টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা বা কোনো সময় কেবল কিস্তির টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। দলগতভাবে ব্যর্থ হলেও গ্রাম্য শালিসের মাধ্যমে আদায় বা বাজার দর অনুযায়ী সম্পত্তি নিলাম করা হয়েছে।

অনেকে ঋণের টাকা কিভাবে কাজে লাগাতে হয় তা না বুঝে অনুৎপাদনশীল খাতে যখন খরচ করে তখন অন্য সদস্যরা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কখনো কোন সদস্য এক কাজের টাকা অন্য কাজে ব্যয় করলে তাকে বুঝানো হয় যে, এতে তার আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি হবে এবং ভবিষ্যতে সে আর ঋণ পাবে না।

ক্ষুদ্র দল দায়িত্ব পালনে যদি ঐকান্তিক হয় তবে গ্রাম সংগঠনের কাজ সুচারুরূপে সমাধা এবং উদ্দেশ্য অর্জন অবশ্যই সম্ভব। পাঁচ জনের দলগঠন তারা সমীচিন মনে করেছেন। দলের গঠন ও গতি ক্ষুদ্র দলের কর্মতৎপরতার সহায়ক ছিল। ক্ষুদ্র দলের উপস্থিতি কর্মচারীদের তৎপর এবং দলগত দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করেছে। তবে বয়স বেশি হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম সংগঠনে দলসহ বা দলছাড়া উভয় ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, কারণ সদস্যরা পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে কাজ করেনি।

তাদের বিশ্বাস সুসংগঠিত হয়ে এ দায়িত্ব পালন তাদের জন্য অতিরিক্ত কোন সুবিধা দেবেনা এবং তাদের অংশগ্রহণ কেবল ব্র্যাকের উণ গ্রহণে সাহায্য করবে। যা তাদেরকে দলের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করেছে। তারপরে সংগঠনের নিয়ম-কানুন মেনে চলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলে গ্রাম সংগঠনে আর ক্ষুদ্র দল থাকেন। এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত লাভের দিকটাই দলের লাভের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। এবং ধীরে ধীরে দায়িত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

যদিও ক্ষুদ্র দল ছাড়াও গ্রাম সংগঠনের সফলতা অর্জন সম্ভব, তথাপি ক্ষুদ্র দলের অবদান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অনস্বীকার্য। তাই যেখানে ক্ষুদ্র দল নেই সেখানে ক্ষুদ্র দল প্রবর্তণ এবং যেখানে ক্ষুদ্র দল নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে সেখানে তাদের সক্রিয় করে গড়ে তুলতে হবে।

বাওড় এলাকায় ব্র্যাকের ক্ষুদ্র জেলে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব[৮]

দিলরুবা আহমেদ, আলতাফ হোসেন ও শাম্‌স মোস্তফা

অসংখ্য হাওড়, বাওড়, নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা আর পুকুরই এ দেশের মৎস্য সম্পদের উৎস। পরিচর্যার অভাবে এ সকল উৎস থেকে দেশে পর্যাপ্ত মৎস্য উৎপাদিত হচ্ছে না।

মৎস্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বল্প মূল্যে প্রোটিনের যোগান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সময়ে এ সকল উৎসগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাওড় এলাকায় ক্ষুদ্র জেলে উন্নয়ন প্রকল্প হলো এ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। প্রকল্পটির উদ্যোক্তা যৌথভাবে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য উন্নয়ন অধিদপ্তর, ডানিডা ও ব্র্যাক। অর্থায়ন করেছে ইফাদ ও ডানিডা।

এই প্রকল্প শুরু হয় ১৯৭৮ সালে এবং এর প্রথম পর্যায়ে শেষ হয় ১৯৮৬ সালে। প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্প শুরু হয় ১৯৯১ সালে। এর পরিসর পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়ায় বিস্তৃত হয়। এই পাঁচটি জেলার ২৩টি বাওড়ের প্রায় এক হাজার তিনশত চৌত্রিশ হেক্টরে মোট ২,৬২৫টি জেলে দল মৎস্য চাষ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মৎস্য শিকার কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সাধারণত: এটি জেলে দল ৮-১০ জন নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বাওড়গুলোর উন্নয়ন, মৎস্য উৎপাদন বাড়ানো এবং সেই সাথে বাওড়ের উপর নির্ভরশীল জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। যে সকল জেলেরা প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে তাদের অধিকাংশই ভূমিহীন ও দরিদ্র। প্রকল্প শুরু হওয়ার আগেও এরা জীবিকা নির্বাহের জন্য এই সকল বাওড়ের উপর নির্ভরশীল ছিল।

জেলেদের জীবনে ও প্রকল্প এলাকায় এ প্রকল্প কতটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করছে তা দেখার জন্য ১৯৯৩ সালে প্রকল্পে একটি মূল্যায়ন করা হয়, এবং ১৯৯৫ সালে একটি পুনঃমূল্যায়নও করা হয়। যে সকল জেলে বিভিন্ন কারণে প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা তাও তুলে ধরা হয়েছে এ সমীক্ষায়।

জেলে পরিবারগুলোর বৈষয়িক সাফল্য নির্ণয় করার জন্য তাদের ঘর-বাড়ির কাঠামো, নির্মান সামগ্রীর ধরন, গৃহস্থালী সম্পদ, হাঁস-মুরগী, মাছ ধরার সরঞ্জাম ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। দেখা গেছে, প্রকল্প শুরুর আগে ছন বা গোলপাতা দিয়ে জেলেদের ঘরের ছাউনি দেয়া ছিল এখন সেখানে টিনের চালের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[8] "Impact of he oxbow lakes project-II on participant households' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন গাজী মাসুম আহমেদ।

অন্যান্য গৃহস্থালী সম্পদ, হাঁস-মুরগী, মাছ ধরার সরঞ্জাম, নৌকা ইত্যাদিও পূর্বের তুলনায় উলেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ তেমন একটা বৃদ্ধি পায়নি।

প্রকল্প বহির্ভূত পরিবারগুলোতেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তবে এক্ষেত্রে প্রকল্পভূক্ত জেলে পরিবারগুলোর অগ্রগতি মুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। প্রকল্প এলাকায় মৎস সম্পদের উন্নয়ন হওয়ায় এলাকার সকলেরই মাছ খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে। রুই-কাতলা জাতীয় কার্প মাছের চাষ হয় বলে এই সব মাছ খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে গেছে। সে তুলনায় অবশ্য দেশী অন্যান্য ছোট মাছ খাওয়ার পরিমাণ বাড়েনি। মৎস্য চাষের কারণে বাজারগুলোতে মাছ সহজলভ্য হয়েছে। ফলে অসদস্য পরিবারগুলোও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে।

কোন মাসে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হতো কখনো বা কম হতো বা কখনো একই থাকতো। এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সামগ্রিকভাবে আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণ গ্রহণের একটি হিসাব থেকে দেখা গেছে, দরিদ্র জেলেদের কেবল উৎপাদনের জন্য নয়, সকল ধরনের পারিবারিক কর্মকাণ্ডের জন্যই ঋণের প্রয়োজন হয়। তবে প্রয়োজনীয় ভু-সম্পত্তি না থাকার কারণে এরা সরকারি কিংবা কারো বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পায় না।

ঋণের জন্য এরা প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন বা চরম দুর্দিনে চড়া সুদে মহাজনী ঋণ নেয়। এসকল ক্ষেত্রেও জেলে পরিবারগুলো অগ্রগতি অর্জন করেছে। ফলে সার্বিকভাবে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমেছে এবং আগের তুলনায় উৎপাদনশীল খাতে ঋণ ব্যয় হয়েছে বেশি। মাসিক ব্যয়ের হিসাবে দেখা গেছে যে, তাদের আর্থিক সংগতি বেড়েছে তবে সদস্য পরিবারগুলোর তুলনায় অন্য পরিবারগুলোর অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। সদস্যরা প্রকল্প এবং ব্র্যাক এই উভয় উৎস থেকেই ঋণ পেয়েছে এবং অন্যান্যরা কেবল ব্র্যাকের ঋন পেয়েছে।

যে সকল জেলে পরিবারগুলো প্রকল্প থেকে সরে পড়েছে তারা পরবর্তীতে কৃষি, ব্যবসা, কিংবা পরিবহন শ্রমিক ইত্যাদি পেশা বেছে নিয়েছে। এদের মধ্যে ব্যবসায়ী ও পরিবর্তন শ্রমিকরা উন্নতি করেছে বেশি এবং ক্ষেত্র বিশেষে জেলে পরিবারগুলোর চাইতেও বেশি। তবে সাধারণভাবে অন্যান্যরা বেশ পিছনে পড়ে গেছে। পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়ার কারণেও অনেকে প্রকল্পভুক্ত হতে পারেননি। আবার অনেকে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দ্বিধান্বিত হয়ে স্বেচ্ছায় কিংবা কারো প্ররোচনায় কিংবা কারো চাপেও সদস্য হতে রাজী হয়নি। কেউ আবার ব্র্যাকের সদস্য হলে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে এই গুজবের কারণে সদস্য হতে চাননি। তবে সমীক্ষাধীন ৩টি বাওড় এলাকায় ১,৮৭৯টি পরিবারের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ছিল জেলে পরিবার। এই প্রকল্প শুরু হওয়ার ফলে ১৬% পরিবার এ পেশা থেকে সরে পড়ে।

প্রকল্পে উৎপাদিত মাছ যাতে দ্রুত বাজারজাত করা যায় সেজন্য রাস্তা তৈরি করা হয়। এটা প্রকল্পের একটি উলেখযোগ্য অবদান। রাস্তা তৈরির ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে ব্যাপক এবং সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে তরান্বিত করেছে। এর ফলে দূরত্ব কমে গেছে এবং সাশ্রয় হচ্ছে সময়ের। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে শ্রম বাজারেরও বিকাশ ঘটেছে। এলাকার শ্রমিক সহজে অন্যত্র কর্মসন্ধানে যেতে পারছে।

ব্র্যাক প্রথমেই সদস্যদের দলভুক্ত করেছে এবং প্রত্যেক দলের একজন দলনেতা নিযুক্ত করেছে। এই দলনেতাদের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে ব্যবস্থাপনা কমিটি। কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ করা সহজ হয়েছে। পোনা সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা, মৎস্য শিকার, মৎস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংগ্রহ ও বন্টন, ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ড এই ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্পের শুরুতে বাওড়ের আগাছা দূরীকরণ থেকে শুরু করে মৎস্য খামার পাহারার ব্যবস্থাও পরিচালনা কমিটির হাতে ন্যস্ত করেছে। এছাড়াও ঋণের অর্থ সংগ্রহ, ঋণ বিতরণ, ঋণের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার, ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য সংশিষ্ট কর্মকাণ্ড এই কমিটি পরিচালনা করে থাকে।

স্বাভাবিকভাবেই সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো সমান সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কোন কমিটির সাফল্য ঈর্ষণীয়, আবার কোনটি অনিয়ম ও ব্যর্থতায় ভরা। পোনা সংগ্রহ, মৎস্য বিক্রয়, বিক্রয়লব্ধ অর্থের অপচয়, সদস্য তালিকা প্রণয়ন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে যা সাধারণ জেলেদের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়েছে। কোথাও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা নিজে বিশেষ সুবিধা অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তবে এরকম একটি বিশাল প্রকল্পের আওতাধীন বিরাট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য দু'বছরের তুলনামূলক বিশেষণ যথেষ্ট নয়। একজন্য প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী পর্যালোচনা। এটুকু নিশ্চয় বলা যায় যে, এলাকাতে একটি ইতিবাচক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে যার জন্য বাওড়ের ক্ষুদ্র জেলে উন্নয়ন প্রকল্প সাফল্যের দাবী করতে পারে।

এলাকাবাসীদের মধ্যে প্রকল্পের সদস্য জেলে পরিবারগুলো তুলনামূলকভাবে অধিক উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পের সদস্য এবং অসদস্য উভয় পরিবারগুলোই উলেখযোগ্য হারে অগ্রগতি অর্জন করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের সাফল্য সদস্যদের তুলনায়ও ভালো। তবে সার্বিক আয়, ঋণ, গৃহস্থালী ব্যয়, মৎস্য সম্পদের ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে সদস্য পরিবারগুলোর অগ্রগতি অন্যান্যদের তুলনায় বেশি।

এলাকাবাসীরা মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে এলাকার উন্নয়ন তরান্বিত হয়েছে, উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় কোথাও অত্যন্ত সুষ্ঠু প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কোথাও অনিয়ম, দূর্নীতির অভিযোগও পাওয়া গেছে।

সার্বিক বিচারে এটি একটি সফল উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এলাকার লোকজন পুষ্টির জন্য বাওড়ের মাছের উপর নির্ভরশীল। দেশী প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে উৎপাদন বাড়ানো আবশ্যক।

যে সকল প্রকৃত জেলে প্রকল্প থেকে সরে পড়েছেন তাদের যাতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা যায় সে ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সার্বিকভাবে সকলের মাঝে এ ধারণা তৈরি হওয়া জরুরী যে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ঋণ কর্মসূচি, ক্ষমতায়ন এবং জন্মনিরোধ ঃ পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব[9]

আব্দুলাহেল হাদী

বিগত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে জন্মনিরোধক ব্যবহার উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা থেকে নারীদের নিজস্ব অবস্থান সৃষ্টি ও পদমর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর অবদান আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছোট ছোট ঋণ নির্ভর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যোগদানের মাধ্যমে নারীরা পরিবারে অর্থনৈতিক অবদান রাখছে। ফলে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীভূত হচ্ছে, আত্মবিশ্বাস বাড়ছে, ঘরের বাইরে কাজ করার সুযোগে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারে মতামত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ঘরে অন্তরীণ নারী লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার। যদিও নারীর ক্ষমতায়ন ঘরের বাইরে কাজ করা ও যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল তবুও এর জোরপূর্বক প্রয়োগ ক্ষতিকর। নারী অবস্থা মূল্যায়নের ক্ষমতায়ন একটি জটিল বিষয়। ক্ষমতায়ন এখানে স্বামী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আলোচ্য সমীক্ষার জন্য ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচিভুক্ত এলাকাসমূহের ১০টি গ্রাম হতে ৫০০ বিবাহিত মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ১৯৯৬ সালের মার্চ হতে মে মাস পর্যন্ত।

এ সমীক্ষায় সুস্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান নয় যে কিভাবে নারীর ক্ষমতায়ন জন্মনিরোধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর আয় বা উপার্জন ক্ষমতা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। স্বামীদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা থাকলে ঋণ কর্মসূচিতে মহিলারাও অধিক আগ্রহ অনুভব করেন। তবে প্রাথমিকভাবে স্বামীদের সম্পৃক্ততা একটি কৌশল মাত্র। যা ধীরে ধীরে পরিবাররে তাদের ক্ষমতায়নে ও মতামত প্রদানের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

বাংলাদেশে জন্মনিরোধক ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও তা সব এলাকায় সমান নয়। শিক্ষা বিস্তার জন্মনিরোধক ব্যবহারে সব এলাকায় সমানভাবে তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য লক্ষণীয়। তবে যে সকল মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা হয়েছে তাদের মধ্যে জন্মনিরোধক ব্যবহারের আগ্রহ বেশি লক্ষ্য করা গেছে। এ ছাড়াও ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের বিষয়টাও জন্মনিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মেয়াদ ক্রয় ক্ষমতা এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তেমন ভূমিকা রাখে না।

কিছু কিছু সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মহিলাদের ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি মহিলাদের পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চলাফেরায় স্বাধীনতা, পরিবারে সম্পর্ক, স্বামীর সাথে সম্পর্ক এবং পারিবারিক সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। এ সমীক্ষায়ও দেখা গেছে, ক্ষমতায়নের প্রতিটি বিষয় প্রজনন স্বাস্থ্য ও জন্মনিরোধক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। স্পষ্টত: লক্ষণীয় যে, ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদের যদি ক্ষমতায়ন হয় তবে তাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

[9] "Credit programme, women's empowrment and contraception: the role of context" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন মোঃ সাইফউদ্দিন আহমেদ।

গ্রহণের আগ্রহ বেশি থাকে। পারিবারিক বা অন্য কোন বিষয়ে মহিলাদের যত বেশি অংশগ্রহণ থাকবে জন্মনিরোধক ব্যবহারে তাদের তত আগ্রহ থাকবে। আবার দেখা গেছে, পরিবারে মহিলাদের ক্ষমতা ও অধিকার বাড়লে জন্মনিরোধের ক্ষেত্রে স্বামীর আপত্তি কিংবা বাধা তারা অতিক্রম করতে পারে। জন্মনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ কর্মসূচির প্রভাব সুস্পষ্ট। এ সমীক্ষার আলোকে বলা যায় যে, যদি ঋণ বিতরণ কর্মসূচি ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা যায় এবং মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা যায়, তবে মহিলাদের মধ্যে জন্মনিরোধক ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেতে পারে।

আশির দশকে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ঋণ কর্মসূচি বৃদ্ধির সাথে সাথে জন্মনিরোধক ব্যবহারের হার কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বৃদ্ধি পেতে থাকে। লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে ও নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ঋণ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এই কার্যক্রম মহিলাদের অবস্থার উন্নয়নে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করছে যা তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক ধ্যান-ধারণা অর্জন এবং পরিবারিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে সহায়তা করছে।

পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি[10]

শাহাদুজ্জামান

তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরপরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উন্নত বিশ্বের তুলনায় অনেক বেশি। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য প্রশংসনীয়।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে যেখানে জন্যসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে সেখানে আমাদের দেশের জনসখ্যা বৃদ্ধির হার হতাশাব্যঞ্জক। তাই সরকার ইতিমধেই এ সমস্যাটিকে দেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন দেশ, দাতা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় সরকারি এবং বেসকারি পর্যায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্তণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে ব্র্যাকও পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ব্র্যাক পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্ত বায়নের পাশাপাশি এগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে সমীক্ষাও পরিচালনা করছে। পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের তুলনামূলকভাবে কম অংশগ্রহণ সাম্প্রতিককালে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এ সমস্যার প্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে পুরুষদের উপলব্ধি কী এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে ১৯৯৬ সালে শেরপুর জেলায়। ১৯৯৪ সাল থেকে এ জেলায় সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি ব্র্যাক তার নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পুরুষদের ধারণা, উপলব্ধি, মতামত, ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের সমাজে স্বামীরাই পারিবারিক সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরিবারে পুরুষের এ অবস্থানের কারণে প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়েও তাদের ভূমিকা অগ্রণী।

শেরপুর জেলায় পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় এ জেলায় মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ছিল দু'লক্ষ চার হাজার নয় জন। এসব সক্ষম দম্পতিদের শকরা ৬৪ ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন না কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা যেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন সেখানে পুরুষের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৩.৫ ভাগ।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায়, অধিকাংশই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হিসেবে খাওয়ার বড়ির কথা বলেছেন। তাদের কথা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বড়ি বিতরণ করা হয় বলে বাহিরে গিয়ে কিনতে হয় না। ফলে মহিলাদের পর্দা ও গোপনীয়তা বজায় থাকে। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম এবং যে কোন সময় বড়ি খাওয়া বন্ধ করা যায়। কতিপয় পুরুষের ধারণা জন্মনিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। অনেকে মনে করেন পুরুষদের জন্য যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে তা

[10] "Men's perception about family planning" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন খালিদ হাসান।

পর্যাপ্ত নয়। পুরুষদের মতে পরিবার পরিকল্পনার অর্থ হচ্ছে পরিবার ছোট রাখা, এক সন্তান থেকে আর এক সন্তান জন্মের সময়ের ব্যবধান নয়। তবে এদের বেশিরভাগই বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং তারা তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখতে চান। নগণ্য সংখ্যক পুরুষ পরিবার পরিকল্পনার বিরোধীতা করেছেন। তারা মনে করেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা ঠিক নয়।

পুরুষদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে বেশ ভুল ধারণা রয়েছে। তাদের ধারণা ভেসেকটমি করলে কর্মশক্তি হ্রাস পায়। এসবল ভ্রান্ত ধারণা মূলত: সঠিক তথ্যের অভাবে জন্ম নিয়েছে। যারা কনডম ব্যবহার করছেন তারা অধিকাংশই তাদের স্ত্রীদের পূর্বে ব্যবহৃত পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে বিকল্প হিসেবে এটি ব্যবহার করছেন।

শেরপুর জেলায় ব্র্যাকের ডিপোহোল্ডারগণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ বেশ জনপ্রিয়। তবে ব্র্যাক প্রদত্ত পরিবার পরিকল্পনা রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়ে মারাত্মক ভুল ধারণা লক্ষ্য করা গেছে। অনেকে মনে করেন, এ কার্ড শিশুদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাওয়ার কার্ড। আবার অনেকে মনে করেন এ কার্ড দিয়ে বিনামূল্যে ঔষধ পাওয়া যাবে। এ কার্ড পরিবার পরিকল্পনার তথ্য সংরক্ষণের জন্য-এ বিষয়টি খুব বেশি লোকের জানা নেই।

সঠিক তথ্য না থাকায় শ্রীলংকার একজন পুরুষ নিয়মিত বড়ি খেতেন। অথচ সন্তান জন্মদান বন্ধ না হওয়ায় তিনি পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের কাছে বড়ির কার্যকারিতা নিয়ে অভিযোগ করেন। তখনই তিনি জানলেন বড়ি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। তবে শেরপুর জেলায় পুরুষদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা এতটা অস্বচ্ছ নয়।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন। এতে জনসাধারণের মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে। সেবা প্রদানকারীদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা এ বিষয়ে সন্তোষজনকভাবে পুরুষদেরকে পরামর্শ দিতে পারেন। সেবা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম সহজলভ্য করতে হবে। সুসংগঠিত পুরুষ ফোরামের মাধ্যমে ব্র্যাকের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সকলে মাঝে ছড়িয়ে দেয়া আবশ্যক।

একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা পুরুষদেরও জানা প্রয়োজন। তা হচ্ছে সন্তান প্রসবের সময় প্রতি বছর সমগ্র বিশ্বে ছয় লক্ষ মা প্রাণ হানান। বাংলাদেশের মায়েরাই এ অকাল ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর শিকার হন বেশি।

শালদুধের পরিবর্তে অন্য তরল খাবার দেয়ার প্রবণতা ঃ মতলব থানার একটি চিত্র[11]

সাবাহ তারাননুম, এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার ও এ এম আর চৌধুরী

বাংলাদেশের সর্বত্রই শিশু জন্মের পরপরই মায়ের দুধের পরিবর্তে পানি বা অন্য কোন তরল খাবার দেয়ার প্রচলন রয়েছে এবং শালদুধ বা কলোস্ট্রাম খাওয়ানোর প্রচলন নাই বললেই চলে। অধিকাংশ মায়েরাই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর আগে শালদুধ ফেলে দেন। তাদের ধারণা শালদুধ শিশুর জন্য ক্ষতিকর। শালদুধ না দিয়ে নবজাতককে দেয়া হয় মধু বা চিনির পানি কিংবা শুধু পানি, যা শিশুর জীবনের জন্য পরবর্তীতে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে শহর কিংবা গ্রামীণ এলাকায় সচরাচর মায়েরা নবজাতকদের প্রথমে বুকের দুধ না দিয়ে এসকল খাবার দিয়ে থাকেন যাকে ইংরেজীতে বলে প্রিল্যাকটিয়াল ফিডিং। এ ধরণের প্রিল্যাকটিয়াল ফিডিং এর কারণে নবজাতকের বিভিন্ন ধরনের অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

শিশুর জন্মের পর বুকের দুধ ছাড়া অন্য কিছু দেয়া উচিত নয়, এমনকি পানিও না। একজন মায়ের উচিত জন্মের পরই শিশুকে শালদুধ দেয়া। কারণ প্রোটিন সমৃদ্ধ এই শালদুধ জন্মের পরের কয়েক মাস পর্যন্ত শিশুর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। অধিকাংশ মা বুকের দুধ দিতে ২/১ দিন দেরী করে। ফলে শালদুধের কার্যকারিতাও কমে আসে। শিশু জন্মের ২/৩ ঘন্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধে শালদুধের পরিমাণ ও তার কার্যকারিতা যে রকম থাকে ২/১ দিন পরে তা ক্রমান্বয়েই কমতে থাকে। আর যদি শালদুধ ফেলে দেন তা হলেতো কথাই নেই।

চাঁদপুর জেলার মতলব থানায় ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি-র যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৫ সালের এপ্রিল-আগস্ট মাসে ১৪টি গ্রাম থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে এই গবেষণাটি কর হয়েছে। লক্ষ্য ছিল দু'টি: গ্রামীণ এলাকায় প্রিল্যাকটিয়াল ফিডিং ও বুকের দুধ দেয়ার অবস্থা এবং শাল দুধ খাওয়ানোর প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা। এছাড়া বুকের দুধ দেয়ার আগে অন্যান্য পানীয় দেয়া সন্তানের জন্য কতটা ক্ষতিকর সে বিষয়ে মায়ের জ্ঞান কতটুকু তা দেখাও ছিল এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। তথ্য নেয়া হয়েছিল দুই বছর বয়স পর্যন্ত সন্তান আছে এধরণের ৪৭৩ জন মায়ের কাছ থেকে।

দেখা গেছে, শতকরা ৭ জন শিশু জন্মের সাথে সাথে মায়ের বুকের দুধ পানের সুযোগ পেয়েছিল এবং অবশিষ্ট শতকরা ৯৩ জন শিশুকেই প্রথম খাবার হিসাবে মধু, চিনির পানি অথবা শুধু পানি দেয়া হয়েছিল। শুধু মধু কিংবা মধু মিশ্রিত পানি দেয়ার প্রবণতাই বেশি দেখা গেছে। এই প্রবণতা ব্র্যাক সদস্য নয় এমন খানার শিশুদের মধ্যে বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুদের মুখে প্রথম তরল খাবার হিসাবে সরিষার তেল দেয়ার কথাও বলেছেন মায়েরা।

---

[11] "Pre-lacteal feedint practices in a rural area of Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন শাহানা হুদা।

নবজাতককে শালদুধ না দেয়ার কারণ হিসেবে মায়েরা বলেছেন বাচ্চা হওয়ার পর পরই বুকে দুধ আসেনা। কেউ বলেছেন জন্মের পর বাচ্চার মুখে মধু দেয়া তাদের পরিবারের ঐতিহ্যগত চর্চা।

শিশুর মুখে এ ধরনের পানীয় দেয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা হয়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা অপরিস্কার হাতে শিশুর মুখে মধু বা পানি তুলে দেন। শালদুধের পরিবর্তে অন্যান্য পানীয় দেয়ার ক্ষেত্রে দাই, দাদী বা নানীরা বেশি উৎসাহী হয়ে থাকেন। যখন বাচ্চা ঘুমায় বা কাঁদে তখনই তার মুখে আঙ্গুল বা চামচ দিয়ে তরল খাবার তুলে দেয়া হয়, যা ডায়রিয়া হওয়ার আশংকা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এমনকি শিশুর শ্বাসনালী ও ফুসফুলে সেই খাবার চলে যাওয়ার ভয় থাকে। এভাবে খাবার দেয়া এতটাই বিপদজনক যে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ব্র্যাক কার্যক্রমের আওতাধীন পরিবারের শতকরা ৬০ জন শিশু ও ব্র্যাক কর্মসূচি বহির্ভূত পরিবারের শতকরা ৭৬ জন শিশুকে শালদুধ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে তবে তা জন্মের পর পরই নয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সদস্যদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। ঋণদান, প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক বৈঠক এবং উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি কর্মসূচিগুলো স্বাস্থ্য, খাদ্যগ্রহণ ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান বাড়াতে সহায়তা করে। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে পরিহার্য স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় বিভিন্ন পরিবারের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর মধ্যে নবজাতককে প্রথম খাবার হিসাবে মায়ের বুকের দুধ না দিয়ে অন্যান্য তরল খাবার দেয়ার পবণতা হ্রাস পাবে।

ব্র্যাক সদস্য এবং লক্ষীভূত খানার পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা[12]

সাবাহ্ তারাননুম, এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার ও এ এম আর চৌধুরী

হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল-এর সহায়তায় ব্র্যাক একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল সাটুরিয়া, সাঁথিয়া ও মির্জাপুর থানার ১০০টি গ্রামে। ব্র্যাক সদস্য এবং সদস্য নয় এমন পরিবারে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা নির্ণয় করা এবং শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত করে যেসব স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক কারণ সেগুলো পরীক্ষা করাই ছিল ঐ জরিপের উদ্দেশ্য।

অপুষ্টি বাংলাদেশে একটি মারাত্মক সমস্যা। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, অপুষ্টির কারণে শতকরা ৫৪ ভাগ প্রাক-স্কুলগামী শিশুরা খর্বাকৃতির এবং শতকরা ১৫ ভাগ শিশু উচ্চতার তুলনায় কম ওজন সম্পন্ন হয়। বর্তমান জরিপটিতে, জাতীয় গড় অবস্থার চেয়ে ব্র্যাকের আওতাভুক্ত পরিবারগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী ও চরম অপুষ্টি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। তবে একই আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন এবং ব্র্যাকের আওতাভুক্ত নয় এমন পরিবারের চেয়ে ব্র্যাকের আওতাভুক্ত নয় এমন পরিবারের চেয়ে ব্র্যাকের আওতাধীন পরিবারের শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার হার কম।

অপুষ্টির বহুবিধ কারণ রয়েছে যা দারিদ্র ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। শিশুর পুষ্টিগত অবস্থার সূক্ষ্ম নির্দেশক হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা এবং খাদ্য সরবরাহ।

সকল লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পুষ্টিগত অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি সাহায্য করেছে। দেখা গেছে যে, ব্র্যাকের কর্মসূচি ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের স্বল্প ও মধ্যম মাত্রার অপুষ্টি কমাতে পেরেছে। জরিপটিতে এও দেখা গেছে যে, শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং পরিচ্ছন্নতা পুষ্টিগত অবস্তার উন্নতির ক্ষেত্রে আয়ের চেয়ে বেশি প্রভাব রাখতে পারে।

দেখা গেছে বয়সের সাথে সাথে শিশুর বেড়ে না ওঠা নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেমন, শিশু ছেলে না মেয়ে, জন্ম ক্রম, বয়স, ডায়রিয়া ও শ্বাসনালীর তীব্র সংক্রমণের অবস্থা, ও খাদ্য গ্রহণ। এছাড়াও রয়েছে পারিবারিক শিক্ষা ও খানা প্রধানের পেশা, মলত্যাগের স্থান ও জনপ্রতি খাদ্য ব্যয়ের প্রভাব। মেয়ে শিশুদের চেয়ে ছেলে শিশুদের বয়সের সাথে সাথে বেড়ে না ওঠার হার বেশি।

জরিপে সদস্যভুক্ত পরিবারের শিশুদের চেয়ে ব্র্যাকের সদস্য নয় এমন পরিবারের শিশুদের অপুষ্টিজনিত ডায়রিয়া ও শ্বাসনালীর সংক্রমণ বেশি লক্ষ্য করা গেছে। অপুষ্টি ও তার প্রভাব শ্বাসনালীর তীব্র সংক্রমণের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম।

---

[12] "Nutritional status of pre- school children among BRAC member and eligible non-member households" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন শাহানা হুদা।

একটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন তার উপর নির্ভর করে একটি শিশু পরিপূর্ণ পুষ্ট কিনা। যেসব খানার আয় বেশি সেসকল খানার শিশুরা পরিপূর্ণ পুষ্ট তবে সব ধরনের পরিবারেই শিশুদের অপুষ্টি কমানোর একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ব্র্যাকভুক্ত দরিদ্র পরিবারগুলোতে 'খাদ্য নিরাপত্তা' নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসেও ব্র্যাকভুক্ত পরিবারের শিশুরা খাদ্যের কষ্টে অতটা ভোগে না। কারণ আকালের সময়টাতে শিশুদের কিভাবে অপুষ্টি থেকে রক্ষা করা সম্ভব ব্র্যাক কার্যক্রমে তা শেখানো হয়। আকালের সময় যখন গ্রামাঞ্চলের মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হয়, তখন ব্র্যাকের ঋণ তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে ফসল ওঠার পর অর্থাৎ ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস উভয় ধরনের পরিবারের শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নতি ঘটে।

বিভিন্ন ধরনের আলোচনায় দেখা গেছে, শিশুর ঠিকমতো বেড়ে ওঠা না ওঠার সঙ্গে ব্র্যাকের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়টি জড়িত। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্র্যাকভুক্ত পরিবারের শিশুদের ঠিকমদো বেড়ে না ওঠার সম্ভাবনা ব্র্যাকভুক্ত নয় এমন পরিবারে শিশুদের চেয়ে কম।

শিশুর পুষ্টি উন্নয়নে ব্র্যাক কর্মসূচির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্র্যাক আরো জোর দিতে পারে এবং আরো বেশি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বসাতে পারে। এছাড়া লক্ষিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি শিক্ষা আরো জোরদার করা দরকার।

কিশোর-কিশোরীদের যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা ঃ প্রয়োজন উপযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম[১৩]

হাশিমা-ই-নাসরিন, মোশ্‌তাক চৌধুরী, আব্বাস ভূইয়া, সৈয়দ মাসুদ আহমদ, আয়শা আজিজ ও এ কে এম মাসুদ রানা

মাদক দ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এবং উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচারের কারণে বিশ্বব্যাপী এইড্‌স এবং অন্যান্য যৌন রোগের বিস্তার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই আজ সকলকে, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের, যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যাতে তারা সঠিক সময়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে এবং এই ভয়াবহ রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা গ্রহণযোগ্য করে তোলা কিছুটা দূরূহ। এজন্য এমন একটি সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন যাতে খোলামেলা আলোচনা করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়। এমন একজনকে বেছে নিতে হবে যার কাছে কিশোর-কিশোরীরা তাদের বয়ঃসন্ধির অনুভূতি প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

উন্নত বিশ্বে এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়কে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সহচরদের সাহায্য নেয়া হয় এবং একজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দলের অন্যান্যদের মাঝে শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া হয়। আমাদের দেশেও এই ধরনের মডেল চলবে কিনা বা প্রকৃতপক্ষে কে বেশি সহায়তা করতে পারবে তা দেখা দরকার। আসলে এইড্‌স প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় শিক্ষা খুবই সহজ এবং কার্যকরী। তাই বয়ঃসন্ধিতে এই তরুণ-তরুণীরা যার কাছে নিজেদের স্পর্শকাতর অনুভূতি ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তাদের মাধ্যমেই প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা পৌঁছানো সহজ হয়।

এ লক্ষ্যে ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে মতলব থানায় একটি গবেষণা পরিচালনা করে। বয়ঃসন্ধির শারীরিক পরিবর্তন, মাসিক, বিয়ে, যৌনমিলন, যৌন অনুভূতি, যৌন সমস্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভাবস্থা ও শিশুর জন্মদান ইত্যাদি সকল বিষয় নিয়েই আলোচনা করে এ তথ্য নেয়া হয় বিবাহিতা মহিলা ও পুরুষদের কাছ থেকে। জানতে চাওয়া হয়েছে উঠতি বয়সে এই সকল বিষয়ে মনের অনুভূতি কার কাছে প্রকাশ করেছেন এবং প্রথমে এ বিষয়ে কার কাছ থেকে জেনেছেন।

---

[13] "Communicationnetwork on reproductive health infromation dissemination to the adolescents" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন গাজী মাসুম আহমেদ।

যৌন বিষয়ক আলোচনা করতে যেহেতু সকলেই লজ্জা পায় তাই ছেলে বা মেয়ে উভয়েই এমন একজনকে বেছে নিয়েছেন, যার কাছে তারা এ ব্যাপারে সহজবোধ করেন। দেখা গেছে, বেশিরভাগ উত্তরদাতাই তার ভাবীর কাছে নিজের অনুভূতি ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বংঃসন্ধিতে শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যে মেয়েদের স্তনের আবির্ভাব ও মাসিক শুরু হওয়া এবং অন্যান্য অনুভূতিও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক মহিলাই স্বীকার করেছেন যে এ বয়সে ছেলেদের সাথে কথা বলতে বা ছেলেদের কথা কল্পনা করতে তারা শিহরিত হতেন। এই অনুভূতির কথাগুলো তাদের ভাবীদের সাথে বা তাদের বান্ধবীদের সাথে আলাপ করেছেন। এক্ষত্রে অনেকে তাদের দাদী, নানী, বড় বোন বা অন্যান্য মহিলাদের সাথেও আলাপ করেছেন। বিশেষ করে মাসিক শুরু হওয়াটা মেয়েদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সময়টাতে মুরুব্বীরা মেয়েদেরকে ছেলেদের থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দেন।

ছেলেরাও তাদের বয়ঃসন্ধির পরিবর্তনগুলো সহজেই বুঝতে পারে। এ সময়ে দাড়ি-গোঁফ ওঠে, মাংসপেশীগুলো সবল হয়ে ওঠে এবং তারাও মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মেয়েদের সাথে যৌনমিলনের তীব্র আকাংখা অনুভব করেন। একজন বলেছেন তীব্র যৌন আকাংখা অনুভব করলে হস্তমৈথুন করেন। এ অনুভূতিগুলো সাধারণত: ছেলেরা বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে তবে অনেকেই তাদের ভাবীর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন। স্বপ্নদোষ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল। অনেকেই মনে করত একটি একটি রোগ, বা এর ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে কিংবা পুরুষাঙ্গের ক্ষতি হয় ইত্যাদি। এ বিষয়ে অনেকেই তাদের ভাবীদের সাথে আলাপ করেছেন। ভাবীরা এর সমাধান হিসাবে দেবরদের বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছেন। মাসিককে সাধারণত: 'শরীর খারাপ' বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে মেয়েদের অনেকেই বড় বোন বা ভাবীকে দেখে অভ্যস্থ হয়েছেন। অনেকেই তাদের দাদী, নানী, বড় বোন বা আত্মীয়ের কাছে শুনেছেন। একজন বলেছেন যে বয়স হলে মাসিক শুরু হবে এবং প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা হবে, এ কথা তার বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছেন। এছাড়া দাদী, নানী, মা, বড় বোন বা আত্মীয়াদের সাথে অনেকে আলাপ করেছেন। ছেলেরা মেয়েদের মাসিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ভাবী, বড় বোন বা আত্মীয়াকে দেখে। অনেকেই এ ব্যাপারে বন্ধুদের কাছ থেকে জেনেছেন। ছেলেদের অনেকেই মনে করেন মাসিকের স্রাব দূষিত রক্ত। অনেকে মনে করেন এটা একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ ভাবেন, মাসিক হলে খুব সাবধানে চলাফেরা করা ভাল, যাতে ঘরের বাবা বা ভাইয়েরা বিষয়টি বুঝতে না পারে।

বিয়ে একটি অতি স্বাভাবিক ও সামাজিক ঘটনা যা ছেলে-মেয়েদের একটি উপযুক্ত বয়সে ঘটে থাকে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে ছেলে-মেয়ে সবাই অল্প বয়সেই ধারণা পেয়ে যায়। তবে এর সাথে প্রজনন ও যৌন বিষয় সম্পর্কে ধারণা জন্ম নেয় আরো পরে। অনেকে আসলে ৮-১০ বছরেই দাদী কিংবা নানীর কাছে এ বিষয়ে শুনেছেন। এক্ষেত্রেও বন্ধু-বান্ধবী বা ভাবীরা অন্যান্যদের চাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিয়ের আলাপে অনেকেই উৎসাহবোধ করেছেন। বিয়ের পর যৌনসঙ্গম করা সম্ভব হবে ভেবে অনেকেই পুলকিত হয়েছেন। অপরিচিত একজন পুরুষের সাথে অন্তরালে থাকতে হবে ভেবে কেউ কেউ আবার ভীতও হয়েছেন। ছেলেরাও এ বিষয়ে তার দাদী-নানীদের কাছে প্রথম ধারণা পায় এবং বয়ঃসন্ধিতে বিয়ে পরবর্তী যৌনতা নিয় কল্পনা করতে আনন্দ পেত। প্রায় সকল ছেলেরাই একজন সুন্দরী স্ত্রীর কথা কল্পনা করে এবং বিয়ের ব্যাপারে বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলোচনা করে। একজন তরুণী তার

স্বপ্নের কথা জানালেন। তিনি বললেন যে তিনি সঠিক বয়সেই বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেন। এরপর স্বামী তাকে ভালবাসবে ও যৌনসঙ্গমে মিলিত হবে। এ বিষয়ে তার বন্ধুদের সাথে সে আলাপ করতেই স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন।

স্থানীয় ভাষায় মতলবে যৌনমিলনকে সহবাস বা স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা বলা হয়ে থাকে। প্রায় সকলেই বিয়ের পূর্বেই যৌনমিলন সম্পর্কে জানতেন। একজন মহিলা জানিয়েছেন, তার ভাবীর কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু জেনেছেন। তিনি জেনেছেন যে বিয়ের পরে স্বামী তার সাথে যৌনমিলন করবে। তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে ধরে নিতে হবে। তিনি আরো জানান, কখনো তার প্রেমিকের সাথে তার যৌনসঙ্গম করতে ইচ্ছে হতো, কিন্তু গর্ভবতী হওয়ার বয়ে তিনি তার ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি। অবশ্য এ কথা তিনি কাউকে বলেননি। অনেকেই প্রথম অভিজ্ঞতায় যৌনমিলনকে ভয় পেয়েছেন। একজন বাসর রাতের প্রথম যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি প্রথমে ভয় পেয়েছেন বটে কিন্তু সাথে সাথে আনন্দও পেয়েছেন। বিবাহিতারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা বান্ধবীদের সাথে আলাপ করেছেন। যৌনমিলনেই যে মহিলারা গর্ভবতী হন তা তারা বিভিন্ন উৎস থেকে জেনেছেন।

শরীর ও মনের আনন্দের জন্য মিলন অপরিহার্য। একজন বলেন এই আনন্দের জন্য স্বামীরা স্ত্রীর ভরন-পোষণের দায়িত্ব নেন। ছেলেদের কারো মতে যৌনমিলন স্বাস্থ্যের জন্য ও ধর্মীয় দিক থেকে ভালো। কেউ আবার স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ বলেও মনে করেন। এ বিষয়ে ১৩/১৪ বৎসর বয়সেই স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে প্রায় সকলেই ধারণা লাব করে থাকেন।

ছেলে-মেয়েরা ১২/১৩ বছর বয়সেই যৌন অনুভূতি কিংবা শরীরে রোমাঞ্চ অনুভব করে। অনেকে তার স্বামীর কাছে যৌন আকাংখার কথা প্রকাশ করতেও লজ্জা পেয়েছেন। মেয়েদের কোন যৌন আকাংখা নেই এমন কথাও দুই জন জানিয়েছেন। একজন বলেছেন, যৌনানুভূতি স্বামীকে বলতে হয় না। স্ত্রীর চেহারা দেখেই স্বামী বুঝতে পারেন তার ভিতরের যৌনাকাংখা। অপর একজন মহিলা জানিয়েছেন, তার যৌনাকাংখায় স্বামী সাড়া না দিলে সে তাকে জোর করে সঙ্গমে লিপ্ত করে।

যৌন সমস্যাবলী নিয়েও অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। যৌন সমস্যা নিয়ে অধিকাংশ মহিলা লজ্জার কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হয়ে তাদের ভাবী, বান্ধবী, কিংবা দাদী অথবা নানীদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। অনেকে স্বামীর সাথে আলাপ করেছেন। যৌন সমস্যা যৌন রোগ কিংবা খারাপ রোগ বলেই আঞ্চলিকভাবে বেশি পরিচিত। যদি কোন মহিলার যৌন অনুভূতি না থাকে কিংবা স্বামীর সাথে যৌন সঙ্গমে আনন্দ না পান তবে যৌন রোগ আছে বলে ধরে নেয়া হয়। অধিকাংশ মহিলাই যৌন সঙ্গমের সময় ব্যথা পান বলে জানান। অধিকাংশ মিহলারাই এ সকল সমস্যার কথা তাদের স্বামীদের সাথে আলোচনা করেছেন। কিন্তু স্বামীরা এসব সমস্যাকে খুব একটা গুরুত্ব দেন বলে স্ত্রীরা মনে করেন না। পুরুষদের যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত পড়া, কিংবা জ্বালা-পোড়া এসব সমস্যা গ্রামীণ এলাকায় রয়েছে। পুরুষরা মনে করেন যাদের চরিত্রে দোষ আছে তাদেরই এ সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ উত্তরদাতাই তাদের এ সমস্যার কথা লজ্জার কারণে জানাতে পারেননি।

জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান ইত্যদি বিষয়গুলো গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধদের মাধ্যমে জেনেছেন। এ সকল সমস্যাবলী নিয়ে অনেকে চিকিৎসকের শরণাপন্নও হয়েছেন। গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের বিষয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখে বা দাদী-নানীদের কাছ থেকেও ধারণা পেয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, যৌন রোগ ও এইড্স বিস্তাররোধে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মাধ্যমে খুঁজে বের করা। স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচার এড়িয়ে চলার মাধ্যমে এইড্স সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব, যদি কিশোর-কিশোরীরা তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলোকে পর্যালোচনা করতে আগ্রহবোধ করে।

আমাদের দেশে যৌন বিষয়ক আলোচনার জন্য মেয়েরা ভাবীকেই বেশি পছন্দ করে যদিও কোন সময় তারা বান্ধবী, দাদী, নানী, বড় বোন, আত্মীয়া, ক্ষেত্র বিশেষে মায়ের সাথেও আলোচনা করে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তারা তাদের ভাবীদের সাথে সহজ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সুতরাং প্রজনন ও যৌন বিষয়ক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারের জন্য ভাবী ও বন্ধুদের নির্বাচিত করে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করলে যৌন রোগ ও এইড্স প্রতিরোধের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হতে পারে।

বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কৃমির প্রাদুর্ভাব[14]

এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার, সাদিয়া এ চৌধুরী ও এ মোশ্‌তাক আর চৌধুরী

পেটে কৃমির সংক্রমণ মানবদেহের একটি অন্যতম সমস্যা যা শারীরিক বৃদ্ধি, ও মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক এই উপদ্রবের শিকার। এর ফলে মানুষের শরীরের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, অপুষ্টিতে ভোগে এবং আরো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়।

এদেশের শতকরা প্রায় আশি ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত জনগণের শতকরা ৫৭ ভাগই অশিক্ষিত। এদের শতকরা মাত্র ৪৪টি খানায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে। এসকল জনগণের মধ্যে কৃমির প্রাদুর্ভাব ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যা রক্তস্বল্পতাসহ বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি করতে পারে। কৃমি নিয়ে শিশুদের উপর কিছু গবেষণা হলেও বয়স্কদের উপর তেমন কোন গবেষণা হয়নি। ব্র্যাক ১৯৯৭ সালে এ বিষয়ে একটি গবেষণা চালায় যার ফলাফলের আলোকে এ নিবন্ধটি রচিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়ার স্বাস্থ্যবান বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এ সমস্যা কতটুকু ব্যাপক তা দেখাই ছিল আলোচ্য সমীক্ষার উদ্দেশ্য। ফুলবাড়ীয়া থানার ১১টি গ্রামের ৩৩৩ জনের উপর এ সমীক্ষাটি চালানো হয়। এদের শতকরা ৬৯ জনই ছিল মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে এ রোগের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বেশি দেখা গেছে। আবার ব্যাপকতার সাথে বয়সের সম্পর্কেও রয়েছে। এ রোগের ব্যাপকতা ১৮-৩৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং ১২-১৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে সবচেয়ে কম। আক্রান্ত দের মধ্যে গুড়া কৃমির আক্রমণ সবচেয়ে বেশি। মলত্যাগের পরে হাত ধোয়া না ধোয়ার ব্যাপারটি এ রোগের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। গবেষণায় দেখা গেছে যারা মলত্যাগ করার পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয় তাদের শতকরা মাত্র ৩১ জন এ রোগে ভোগে, আর যারা সাবান ব্যবহার করে না তাদের শতকরা ৭৭ জনই কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

[14] "Prevalence of intestinal parasites in healthy adult and adolescent population of a rural community" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন নূরজাহান আকতার সেতু।

ইতিপূর্বে পরিচালিত কিছু গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, এই রোগে লোকজন খুব বেশি ভুগতো। কিন্তু আলোচ্য সমীক্ষায় একটু ভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। আর তা হলো বেশ কয়েক বছর পূর্বে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলের তুলনায় এখন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩৩%) লোক এ রোগে ভুগছে। এর কারণ হলো যে, তখন গ্রামের জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কিংবা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে মোটেই ধারণা ছিলনা। আর তখনকার সমীক্ষাটি ছিল শিশুদের নিয়ে এবং বর্তমান সমীক্ষাটি যুবক ও কিশোরদের নিয়ে পরিচালিত।

এ সমীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, বক্র কৃমি সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছে। দেশে-বিদেশে এ সক্রান্ত অন্যান্য সমীক্ষার ফলাফলেও একই তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ বক্র কৃমির প্রাদুর্ভাব সব দেশে সব সময়ই আছে। এর কারণ হতে পারে যে, বক্র কৃমি তাদের জীবনচক্র পূর্ণ করার জন্য অনুকূল অবস্থা পায়। আর ১৯-৩৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি হবার কারণ হল, এ বয়সে মানুষের বাহিরে চলাফেরা অর্থাৎ গতিশীলতা বেশি বলে পরিবেশের ক্ষতির প্রভাব তাদের মধ্যে পরেও বেশি। যারা হাত ধোয়ার জন্য সাবান ব্যবহার করে তাদের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব অনেক কম, অন্ততঃ তাদের চেয়ে কম যারা সাবান ব্যবহার করে না।

পল্লী অঞ্চলের জনগণের মাঝে কৃমির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি। শরীরের বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে কিংবা বিভিন্ন জটিল রোগ থেকে মুক্ত থাকতেও সকল বয়সের জনগণের কৃমিমুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরী। গ্রামীণ জনগণের মাঝে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মলত্যাগের পর তারা শুধু পানি দিয়ে নামে মাত্র হাত ধোয়। এ রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য এ অভ্যাসও অনেক ক্ষেত্রে দায়ী।

স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর আরো গুরুত্ব দিয়ে এ পরিস্থিতির জরুরী উন্নয়ন আবশ্যক। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও ব্যাপক আকারে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার।

পুরুষ ও মহিলাদের রক্তস্বল্পতা নিয়ে একটি সমীক্ষা[15]

এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার, সাদিয়া এ চৌধুরী ও এ মোশ্‌তাক আর চৌধুরী

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে রক্তস্বল্পতা একটি প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো আর্থ-সামাজিক দূরাবস্থা, শিক্ষা ও দারিদ্র পরিস্থিতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সারা বিশ্বে প্রায় সত্তর কোটি মানুষ রক্তস্বল্পতার শিকার। তাদের অধিকাংশেরই বসাবস দক্ষিণ এশিয়ায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কমপক্ষে ৩৬ শতাংশ জনগণ রক্তস্বল্পতায় ভোগে। কিন্তু উন্নত বিশ্বে এ হার মাত্র ৮ শতাংশ।

রক্তস্বল্পতা নিয়ে বাংলাদেশে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। কিছু হয়ে থাকলেও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অভাবে বাস্তব কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, সুইডেনের উমিয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের অণুজীব বিভাগের সহযোগীতায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর রক্তস্বল্পতা নিয়ে একটি সমীক্ষা চালায়। রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব, এর সম্ভাব্য কারণ, জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জনস্বাস্থ্য ও গর্ভকালীন স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় এ সমীক্ষার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া থানার ১২টি গ্রামের ১০৬ জন পুরুষ ও ১১-৪৮ বছর বয়স্কা (যারা গর্ভবতী নন) ২২৮ জন মহিলার কাছ থেকে এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ মতে রক্তস্বল্পতার সংজ্ঞা নির্ধারণে ১৫-৪৮ বছর বয়স্কা মহিলাদের (গর্ভবতী নন) রক্তে ১২০ গ্রাম/লিটার হিমোগ্লোবিন ও ১১-১৫ বছর বয়স্কাদের বেলায় ১৩০ গ্রাম/লিটার হিমোগ্লোবিন ধরা হয়েছে।

রক্তস্বল্পতার ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি। একই বয়সের মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার কম। পুরুষদের রক্তস্বল্পতা জন্য বয়স কোন ব্যাপার না হলেও মেয়েদের মধ্যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে রক্তস্বল্পতার প্রবণতা বাড়তে থাকে। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয় এমন খানার মহিলাদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রবণতা বেশি। রক্তস্বল্পতার ক্ষেত্রে শিক্ষা তেমন কোন প্রভাব ফেলেনি। আবার বিষয়টি এমন নয় যে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন পুরুষদের কিংবা মহিলাদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রবণতা বেশি বা কম। আবার যাদের কম জমি আছে তাদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার প্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। তবে যারা ৫০-১৯৯ শতাংশ জমির মালিক তাদের মধ্যে এর প্রবণতা অতটা লক্ষ্য করা যায় না। ভূমির পরিমাণ ২০০ শতাংশের বেশি এমন ছোট একটি গোষ্ঠীর মধ্যেও রক্তস্বল্পতার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও এ হিসেবে একটি বড় ধরনের গরমিল রয়ে গেছে। যার ফলে বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নেয়া কষ্টকর হয়।

এ সমীক্ষা থেকে দেখা যাচেছ যে, প্রায় শতকরা ৬৯ ভাগ পুরুষ ও ৭০ ভাগ মহিলা (যারা গর্ভবতী নন) রক্তস্বল্পতার শিকার। তবে যেহেতু এ চিত্র মাত্র ১২টি গ্রামের তাই গোটা দেশের চিত্র অনুরূপ হবে তা বলা যাবে না।

---

[15] "Anaemia among apparently healthy male and females" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন নূরজাহান আকতার সেতু।

দরিদ্র অর্থনৈতিক অবস্থা মহিলাদের ক্ষেত্রে রক্তস্বল্পতা একটি অন্যতম কারণ হিসাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি রক্তস্বল্পতার সাথে সংশিষ্ট নয় বলে দেখা গেছে। এ বিষয়টির সাথে শিক্ষার কোন সংযোগ লক্ষ্য করা যায়নি। অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয় যে শিক্ষিতদের রক্তস্বল্পতা নেই আর অশিক্ষিতদের রক্তস্বল্পতা আছে।

গ্রামীণ মহিলাদের মাধ্যমে এইড্‌স বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ ব্র্যাকের একটি পাইলট প্রকল্প[16]

হাশিমা-ই-নাসরিন

এইড্‌স একটি ভয়াবহ রোগ যার পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু। এই রোগের না আছে কোন চিকিৎসা, না আছে প্রতিষেধক। এই রোগের ফলে মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সাধারণ সংক্রামক ব্যাধিসমূহ এইড্‌স রোগীর ক্ষেত্রে পরিণত হয় মরণ ব্যাধিতে।

এক হিসাবে ১৯৯৬ সালের শেষে সারা বিশ্বে এইড্‌স আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল সোয়া দুই কোটিরও বেশি। আশংকা করা হচ্ছে, দুই হাজার সাল নাগাদ এদের সংখ্যা চার কোটি ছাড়িয়ে যাবে এবং তার প্রায় এক কোটিই হবে এশিয়া মহাদেশে।

বাংলাদেশও এই ভয়াবহ বিপদ থেকে মুক্ত নয়। এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন লাখ লোকের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে যার মধ্যে ৭৯ জনকে (মে '৯৭ পর্যন্ত) এইড্‌স ভাইরাস আক্রান্ত বলে সনাক্ত করা হয়েছে। দশ জনকে পাওয়া গেছে যাদের শরীরে রোগের উপসর্গগুলো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং এদের মধ্যে পাঁচ জন ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। এসকল রোগের ভয়াবহ দিকগুলো হলো ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার দীর্ঘ দিন পরে রোগের প্রকাশ ঘটে এবং সে নিজের অজান্তেই অন্যদের সংক্রমিত করে থাকে। একজন আক্রান্ত ব্যক্তি সনাক্ত করা গেলে ধারণা করা হয় ঐ এলকায় আরো ২৫-১০০ জন আক্রান্ত ব্যক্তি রয়েছেন যাদের সনাক্ত করা হয়নি বা সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এসকল বিষয় বিবেচনা করে এইড্‌সকে ভয়াবহতম রোগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যদিও এ রোগের কোন চিকিৎসা বা প্রতিষেধক নেই তথাপি আজ বিজ্ঞানীরা এটুকু নিশ্চিত যে, এরোগ কেবল মাত্র যৌনমিলন ও রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌনমিলন ঘটালে বা তার রক্ত বা রক্তের কোন উপাদান গ্রহণ করলে বা তার ব্যবহৃত কোন সূচ যা রক্তের সংস্পর্শে এসেছে এমন কোন ধারাল অস্ত্র অন্য ব্যক্তি পুনঃব্যবহার করলে এ রোগ ছড়াতে পারে।

স্বাভাবিক দেনন্দিন কর্মকাণ্ড যেমন এক সাথে একই পেটে খাওয়া দাওয়া করলে, একই সাথে ঘুমালে বা আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড় চোপড় পরিধান করলে, হাতে হাত মিলালে কিংবা হাঁচি, কাশি, মলমূত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বা পোকা-মাকড় বা মশার কামড়ে এ রোগ ছড়ায় না।

যারা একাধিক সঙ্গীর সাথে যৌনমিলন করেন, যারা সমকামী অথবা যারা পতিতাদের সংসর্গে আসেন অথবা যারা ঘন ঘন রক্ত বা রক্তের কোন উপাদান গ্রহণ করেন কিংবা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণ করেন কেবল তাদেরই এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে বেশি।

---

[16] "Providing AIDS awareness education through village based women's organizations" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন গাজী মাসুম আহমেদ।

সুতরাং বলা যায়, যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করলে, একাধিক যৌনসঙ্গী পরিহার করলে, সমকামিতা বা পতিতাবৃত্তি পরিহার করলে, রক্ত পরীক্ষা করে এইচ, আই, ভি, মুক্ত রক্ত সঞ্চালন করলে, ইনজেকশন জাতীয় ঔষধ ব্যবহারে সময় ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, সূচ ইত্যাদি ব্যবহার করলে এবং এইড্স রোগী গর্ভবতী না হলে এই রোগ ছড়ানোর কোন ভয় থাকেনা । সঠিক স্বাস্থ্য শিক্ষা মাধ্যমে সকলের মাঝে এইড্স বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে এ রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশ এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী এ রোগ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার করে সঠিক পদক্ষেপ নির্ধারণ করা একান্ত জরুরী।

সারা দেশের প্রায় পঞ্চাশ হাজার গ্রামে ব্র্যাক পরিচালিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মকাণ্ড বিদ্যমান। এই কর্মকাণ্ডের মূল অংশীদার গ্রামের অশিক্ষিত ও দরিদ্র মহিলা। এইড্স বিয়ষক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্র্যাক ও আইসিডিডিআর,বি এক যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রথমে ব্র্যাকের মাঠকর্মী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে এই মাঠ ও স্বাস্থ্য কর্মীরা স্বাস্থ্য সেবিকাদের নিকট এইডস বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী উপস্থাপন করে। তৃতীয় পর্যায়ে এই স্বাস্থ্য সেবিকাগণ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত গ্রামীণ মহিলা সমিতির সদস্যদের এইড্স বিয়ষক তথ্যাবলী অবহিত করেন। এই মহিলা সদস্যরা পরবর্তীতে তাদের স্বামী ও প্রতিবেশীদের মাঝে এই জ্ঞান ছড়িয়ে দেন। পাঁচটি মূল বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হয়। সেগুলো হলো, এইড্স কী, এইড্স কিভাবে ছড়ায়, এইড্স কিভাবে ছড়ায় না, কিভাবে এইড্স প্রতিরোধ করা সম্ভব, এবং কারা বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন? এ সব বিষয়গুলো জানা থাকলে এইড্স থেকে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত সহজ।

এই সকল কর্মকাণ্ডের মাঝে দুইটি পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, প্রশিক্ষণ দেয়ার পূর্বে এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার পরে। প্রশিক্ষণের পূর্বে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীই এইড্স রোগের নাম পর্যন্ত শোনেনি। প্রশিক্ষণের পরে তাদের সকল বিষয়ে ধারণ পরিস্কার হয়। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এই যে, গ্রামীণ মহিলারা তাদের স্বামী বা প্রতিবেশীদের মাঝে এ বিষয়ে তথ্যসমূহ সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারেনি। এর জন্য সম্ভবতঃ আমাদের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। কেননা যৌন বিষয়ক আলোচনা যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন তা আলোচনা করা এক ধরনের অপরাধ বা লজ্জাজনক ব্যাপার বলেই এখনো মনে করা হয়।

এই পাইলট প্রকল্পটি যদিও কেবল একটি থানায় পরিচালিত হয়েছে তথাপি বলা যায়, সার্বিকভাবে সমগ্র দেশের চিত্র একইরূপ এবং এদের সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির আশু পদক্ষেপ নেয়া একান্ত জরুরী। সচেতনতা বৃদ্ধি ব্যয়বহুল কোন প্রক্রিয়া নয়। ব্র্যাক পরিচালিত এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় পঁচিশ হাজার লোককে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছানো হয়েছে এবং জনপ্রতি খরচ হয়েছে মাত্র সাড়ে পাঁচ টাকার মত। অতএব মহামারী আকারে এইড্স-এর বিস্তৃতি রোধের একমাত্র উপায় হচ্ছে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি। এ লক্ষ্যে এই ধরনের কর্মসূচি বড় আকারে বাস্তবায়নই পরবর্তী পক্ষেপ হওয়া উচিত।

শরীরচিত্র অংকনের মাধ্যমে জন্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে মহিলাদের ধারণা নির্ণয়[১৭]

শাহাদুজ্জামান ও এ এম আর চৌধুরী

বর্তমানে ত্বরিত গ্রাম সমীক্ষা (আরআরএ) এবং অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষাকে (পিআরএ) কম সময়ে ও স্বল্প খরচে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি উত্তম উপায় হিসোব বিবেচনা করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে মৌখিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের চেয়ে অংকন বা এ জাতীয় কোন দৃশ্যমান মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এ বিষয়টি স্বাস্থ্য গবেষণার ক্ষেত্রেও সম্প্রতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বডি ম্যাপিং কিংবা শরীরচিত্র অংকনও এমন একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবেষণা করা হচ্ছে।

শরীর সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা অর্জনের একটি সহজ পদ্ধতি হলো বডি ম্যাপিং বা শরীরচিত্র অংকন। এই বডি ম্যাপিং এর মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞানহীন মহিলারা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহজেই দেখাতে পারেন। জন্ম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে মহিলাদের কি ধারণা, এ বিষয়ে তাদের মত-পার্থক্য, কিংবা শরীরের জটিল বিষয়ে তাদের জ্ঞান সম্পর্কে সহজে ধারণা পাওয়া যায়। মহিলারা তাদের এ অংকন খুব উৎফুল্ল হয়ে উপস্থাপন করেন এবং এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ সম্ভব। গবেষণার এটি একটি কৌশল যা ব্যবহার করে মহিলাদর জন্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও লোকজ ধারণার মধ্যে পার্থক্যও ধরা পড়ে।

মহিলাদের জন্ম প্রক্রিয়া নিয়ে ব্র্যাক এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালায়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্য সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি হিসেবে শরীরচিত্র অংকনের মূল্যায়ন এবং জন্ম প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তিন ধরনের মহিলার মানসিক চিত্রের তুলনা। এ তিন ধরণের মহিলা ছিলেন; প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রী যাদের কমপক্ষে ১০টি প্রসব করানো অভিজ্ঞতা রয়েছে, এবং যারা কখনো ধাত্রী হিসোব কাজ করেনি।

তাদের প্রত্যেককে নারী দেহের একটি রূপরেখা দেয়া হয়। একজন গর্ভবতী নারীর পেটের ভিতরের অংশটি কেমন তা তার ধারণামত আঁকতে বলা হয়। অংকনের পর তাদের আবার সাক্ষাৎকার নেয়া হয় এবং অংকিত অঙ্গসমূহকে বর্ণনা করতে বলা হয়।

মহিলাদেরকে যখন তাদের প্রজননতন্ত্রের একটি ছবি আঁকতে বলা হয় তখন তারা সলজ্জ নিরবতা পালন করেন। এ রকম অংকনের কাজ তারা কখনো করেননি এ কথাও বলেছেন। তাদেরকে তখন বোঝানো হয় যে এটা তাদের জন্য কোন পরীক্ষা নয়। পরবর্তীতে তারা ক্রমশঃ সহজ হয় এবং সকলেই আঁকতে শুরু করেন।

---

[17] "Exploring women's perception on birth process through body mapping" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এইচ আর তালুকদার।

দেখা যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীরা পাজর, কলিজা, পাকস্থলী, যোনী, জরায়ু, ফুল, ডিম্বাশয়, ও জরায়ুতে বাচ্চা ইত্যাদি অংকন করেন। তারা প্রজনন অংগকে তলপেটের নিম্নভাগে চিহ্নিত করেন। অন্যান্য অংগগুলো পেটের উপরের অংশে আঁকেন। এদের বিশেরভাগের স্পষ্ট ধারণা আছে যে, প্রতি মাসে ডিম্বাশয় থেকে ডিম নির্গত হয়। তারা মনে করেন বাচ্চার থলি একটি উল্টো কলসির মত। এদের কেউ কেউ বলেন বাচ্চার থলি জরায়ুর উপর গুটানো বেলুনের মতো থাকে যা গর্ভবতী হওয়ার পরে ফুলে উঠে। এখানে লক্ষণীয় যে চিকিৎসা শাস্ত্রে যাকে জরায়ু বলা হয় ধাত্রীরা তাকে বলেছেন শুধু বচ্চার থলি এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে যাকে যোনী বলা হয় তাকে তারা বলেছেন জরায়ু।

ধাত্রীদের বেশিরভাগ গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবের সময় বুকের চারপাশে একটি ফিতা বেধে রাখতেন। তাদের ধারণা ছিল যে, প্রসবের সময় ফুল উপরে উঠে কলিজা স্পর্শ করে। ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরে তারা আর এ কাজ করেন না। বাচ্চার থলি বলতে তারা যা বোঝান তার মধ্যেই ফুল অংকন করেন। তাদের ধারণা ফুলের মধ্যেই খাদ্য আর রক্ত মিশ্রিত হয়ে পরে শিশুর শরীরে প্রবেশ করে।

প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রীরা অভ্যন্তরীণ যে অংগ অংকন করেন, তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের থেকে একটু আলাদা। তারা প্রজনন অংগগুলো তলপেটের নিম্নভাগে দেখান। তারা আলোচনাকালে মহিলাদের শরীরের মধ্যে ডিম রয়েছে উলেখ্য করলেও এর অবস্থান কোথায় কিংবা এটি শুক্রাণুর সাথে কিভাবে সংযুক্ত হয় তা বলতে পারেননি। কেউ উলেখ্য করেন গর্ভবতী হলে বাচ্চার থলি সাময়িকভাবে বড় হয় এবং প্রসবের সাথে বের হয়ে আসে। আবার কেউ বলেন বাচ্চার থলি যোনীর উপরে গুটানো বেলুনের মতো থাকে এবং গর্ভবতী হলে বড় হয়। কেউ বাচ্চার থলিকে বৃত্তাকার কিংবা ডিমের মত আঁকেন। তাদের মধ্যে একটি সাধারণ বিশ্বাস কাজ করে যে, থলির ভিতর বাচ্চা বড় হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পরে জরায়ুতে চলে আসে। সেখানে বাচ্চা কিছু দিন অবস্থান করে। প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রীদের ক্ষেত্রেও জরায়ু এবং যোনী বিষয়ক পরিভাষাগত বিভ্রান্তি দেখা যায়।

ফুলের অবস্থান নিয়েও বিভ্রান্তি ছিল অনেকের। এদের বেকল একটি দল যোনীর শেষ প্রান্তে ফুলের অবস্থান দেখাতে পেরেছেন। কেউ আবার মনে করেন জরায়ুর মধ্যেই ফুল অবস্থান করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী ও প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রীরা উভয়েই মায়ের পাকস্থলীর সাথে বাচ্চার সংযোগকারী একটি নল অংকন করেন।

যে মহিলারা কোন প্রশিক্ষণ পাননি কিংবা কোন ধাত্রীর কাজও করেননি তাদের বেশিরভাগই কেবল ভাতের থলি, বাচ্চার থলি এবং বাচ্চা আঁকেন তবে তাদের নির্দিষ্ট কোন অবস্থান দেখাতে পারেননি। তাদের কোন সুনির্দিষ্ট আকারও লক্ষ্য করা যায় না। এর কোনটি বৃত্তাকার, কোনটি ডিম্বাকার আবার কোনটি বর্গাকার।

এই মহিলাদের বেশিরভাগ বিভিন্ন আকৃতির থলি আঁকেন। তাদের ধারণা বাচ্চা এখানেই থাকে এবং বড় হয়। তারপর এক সময় থলি ফেটে বাচ্চা বের হয়ে আসে। এদের একটি দল নারী দেহে ডিমের কথা বলেন, কিন্তু ডিম কোথায় থকে তা দেখাতে পারেননি। কেবল একটি দল যোনী আঁকেন এবং অন্যান্য মহিলাদের মতো যোনীকে জরায়ু হিসেবে চিহ্নিত করেন। মজার ব্যাপার হলো যাদের ধাত্রী বিদ্যা জানা নেই এমন মহিলারা থলির ভিতর বাচ্চা, বাচ্চার হাত, পা, এমনকি জামা পরিহিত বাচ্চার ছবিও আঁকেন।

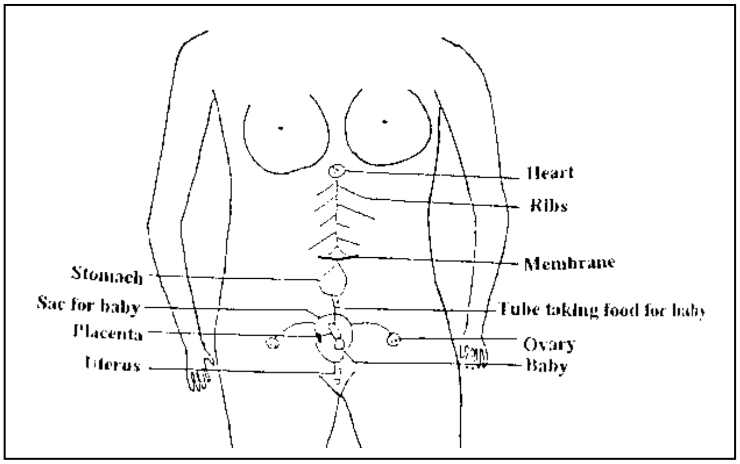

দেখা যাচ্ছে, প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রীদের চেয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের অংকন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান দেখানো বেশি সঠিক। প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রীরা ডিম, ডিমের থলি বা ডিম্বনালী কোনটাই আঁকেননি। এতে বোঝা যাচ্ছে ধাত্রীদের জন্ম প্রক্রিয়া সম্পর্ক ধারণার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

ধাত্রী বিদ্যাবিহীন মহিলারা যা কিছু এঁকেছেন তা খুবই অস্পষ্ঠ জন্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক কোন ধারণা তাদের নেই। এঁরা বিশ্বাস করেন যে, মা যা কিছু খান বাচ্চার শরীরের উপর তার প্রভাব পড়ে। একজন বলেন যে, ইলিশ মাছের গন্ধ পেটের বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর। এ ধারণা কম-বেশি সকল মহিলাদের মধ্যেই ছিল।

ধাত্রী বিদ্যায় যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদর প্রশিক্ষণ থাকুক আর না থাকুক প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ঠ। তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এই ধারণার স্পষ্টতা আরো খানিকটা বেশি।

প্রশিক্ষণ কিংবা অভিজ্ঞতা নির্বিশেষে এই তিন শ্রেণীর মহিলাদের ধারণায় কিছু মিলও ছিল। যেমন সকল দলেরই কেউ না কেউ মায়ের পাকস্থলীর সঙ্গে শিশুর সংযোগকারী একটা নালী এঁকেছেন, যা দিয়ে শিশুর খাদ্য সরবরাহ করা হয় বলে তাদের ধারণা। এছাড়া বিভিন্ন দলের অনেক মহিলাই চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় যাকে যোনী বলা হয় তাকে জরায়ু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ্য, এই লোকজ পরিভাষা জানা না থাকলে স্বাস্থ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে ভুল হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

পরিশেষে বলা যায় গ্রামীণ মহিলাদের কাছ থেকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য শরীরচিত্র অংকন একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। ধাত্রীদের প্রশিক্ষণের একটি কৌশল হিসেবেও এটা ব্যবহার করা যায়। এমনকি স্বাস্থ্য শিক্ষা একটি উৎকৃষ্ট কৌশল হিসেবেও শরীরচিত্র অংকন ব্যবহার করা যায়।

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্জ্য নিস্কাশন ঃ একটি পরিবেশগত সমীক্ষা[১৮]

নাসিমা আকতার, র‍্যাচেল ই এক্‌ট, এম জি সাত্তার ও সাদিয়া এ চৌধুরী

বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের প্রতি এদেশের মানুষের কম-বেশি সচেতনতা থাকলেও হাসপাতাল বর্জ্যের প্রতি সকলেরই কম-বেশি অজ্ঞতা রয়েছে। অথচ এই বর্জ্যের কারণে গুরুতরভাবে দূষিত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও মানবিক এবং সামাজিক পরিবেশ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাটি, ভূগর্ভস্থ ও উপরিভাগের পানি এবং বাতাস দূষণের ফলে ছড়িয়ে পড়ছে রোগ-ব্যাধি। নানা ধরণের অসুস্থতায় আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের জন্য হাসপাতাল বর্জ্য গুরুতর হুমকি হয়ে ওঠায় এক দিকে সকলের যেমন সতর্কতামূলক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন তেমনি একই সঙ্গে প্রয়োজন এর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এতদসংক্রান্ত দূষণ প্রতিরোধে যেসব সরকারি বিধি-নিষেধ রয়েছে তা নিতান্তই অপর্যাপ্ত; কারণ এতে স্বাস্থ্য কর্মীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে যেমন কোন দিক নির্দেশনা নেই, তেমনি অন্যদিকে আইন লংঘনকারীদের শাস্তি দেয়ার বিধান অতি সামান্যই।

এমন এক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ব্র্যাক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে (বিএইচসি) হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল (১) ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের হাসপাতাল বর্জ্য নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে সচেতনতার মাত্রা নিরূপণ; (২) বিএইচসিসমূহে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয় তা দেখা; ও (৩) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে ন্যুনতম পর্যায়ে নিয়ে যেতে কী কী উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করে সুপারিশ প্রণয়ন।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দিনাজপুরে ও ময়মনসিংহ জেলায় এ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ময়মনসিংহ জেলার ১১টি বিএইচসির মধ্যে নয়টি এবং দিনাজপুর জেলার সবগুলি বিএইসি পরিদর্শন করা হয়েছে। সব বিএইচসিতে একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা নেই। কোনও কোনও বিএইচসিতে রয়েছে প্রসবকালীন সেবার ব্যবস্থা। আবার কোথাও রয়েছে কফ, কাশি, রক্ত, মল ও মূত্রের পরীক্ষার ব্যবস্থা। এখানে উলে্লখ্য, প্রতি থানায় একটি বিএইচসিতে রয়েছে এ ধরনের ল্যাবরেটরির সুযোগ।

এই সমীক্ষার আওতায় যেসব বিএইচসিতে প্রসবকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থা অথবা ল্যাবরেটরি কিংবা উভয় ধরনের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলোকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কারণ এই সব কেন্দ্রগুলিতেই অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ ও প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য উৎপাদিত হয়। গর্ভফুল, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, সূচ, কফের পাত্র ও রাসায়নিক বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ কেন্দ্রে এগুলো রাখা হয় প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগে। ওই অবস্থাতেই এগুলো পুড়িয়ে ছাই করা হয়। গর্ভফুল, সূচ, সিরিঞ্জ, তুলার ব্যাণ্ডেজ, স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রভৃতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফেলা হয় কংক্রিটের কূপে।

---

[18] "Medical waste disposal at BRAC health centres: an environmental study" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৭)। সার-সংক্ষেপ করেছেন সায়্যাদ কাদির।

যে সব কেন্দ্রে এ ধরণের কূপ নেই সেখানে সিরিঞ্জ থেকে সূচ আলাদা করা হয়। পরে সিরিঞ্জগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়, আর সূচগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। পোড়ানো জিনিসগুলোর ছাইও মাটিতে পোঁতা হয়।

পরিদর্শনের সময়ে কোন কোন কেন্দ্রে ঔষধপত্রের খালি প্যাকেট ও র‍্যাপার যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা গেছে। ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত রানায়নিক দ্রব্যাদি আশে পাশের নালা-নর্দমায় ঢেলে দেয়া হয়। এতে আশেপাশেতর পরিবেশ দূষিত হয় মারাত্মকভাবে। ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত জাইলিন, ফেনল, মিথাইলিন ব্লু,হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ক্লোরিন, কার্বল ফাকসিন প্রভৃতি বর্জ্য হিসেবে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

সমীক্ষার আওতাভুক্ত কেন্দ্রগুলোর কোন কর্মীরই বর্জ্য নিস্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। উৎপাদিত বর্জ্যের বিপদজনক দিক সম্পর্কে মোটামুটি সচেতন থাকলেও বিএইচসি-র চিকিৎসকগণ মনে করেন বিদ্যমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক। পরিচালিত জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে কর্মরত প্যারামেডিক, নার্স অথবা আয়াদের হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই। প্যারামেডিক, নার্স ও আয়া কারও প্রশিক্ষণ নেই বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন সম্পর্কে।

প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বিএইচসির আশু করণীয় সম্পর্কে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন:

- হাসপাতাল বর্জ্য সম্পর্কে স্বাস্থ্য কর্মীরা যেহেতে সচেতন নন তাই তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং কর্মস্থলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন;

- স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা কর্মসূচির নীতিমালা যেহেতু ঠিকমতো মেনে চলছে না তাই তাদের কাজ-কর্ম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা উচিত। পাশাপাশি নীতিমালার উপযোগিতা পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে;

- বর্জ্য পোঁতার স্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে লিখিত বিবরণও রাখা উচিত;

- জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা আলাদা স্থানে নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে;

- টিবি স্লাইডগুলোতে সীডারউড-এর পরিবর্তে তরল প্যারাফিন ব্যবহার করা উচিত, কারণ প্রারাফিন বিষাক্ত নয়। একইভাবে বর্জন করা উচিত জাইলিন-এর ব্যবহার;

- নিস্কাশনের আগে বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগ ব্যবহার করা প্রয়োজন অর্থাৎ বিভিন্ন রঙের পলি ব্যাগে বর্জ্য পদার্থ আলাদা রাখা। এই ব্যাগগুলোতে স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য একটি নির্দেশনা থাকে যে, হাসপাতাল বর্জ্য স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর;

- হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরিতে রানায়নিক ব্যবহারের পরিমাণ এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর এগুলোর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে দতন্ত করে দেখা দরকার। এজন্য তদন্তের পরিধি বাড়াতে হবে; এবং

- ল্যাবরেটরি টেননিশিয়ানসহ রাসায়নিক পদার্থ সরাসরি ব্যবহারকারী সকল কর্মীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্ত নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এছাড়া ভবিষ্যতের জন্য কিছু সুপারিশও করা হয়েছেঃ

- স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ফেনল-এর পরিবর্তে ডেটল ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টেরিলাইজেশন বা জীবাণুমুক্ত কাজে অটোক্লেভ মেশিন স্থাপন করা উচিত;

- বর্জ্য পোড়ানোর কাজে সেলফ কনটেনড ইনসিনরারেটর ব্যবহার করা উচিত; এবং

- ল্যাবরেটরির বর্জ্য পানির জন্য স্বল্প ব্যয়ের পরিশোধক ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

বস্তুত: এসব সুপারিশের ভিত্তিতে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব।

১৯৯৮-এর বন্যা ও বন্যাকবলিতদের উপর ব্র্যাকের একটি ত্বরিত সমীক্ষা[১৯]

বন্যা সমীক্ষা দল

১৯৯৮ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ শতাব্দীর এক ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিল। এ বন্যার ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব স্মরণকালের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করেছে।

দেশের দুই-তৃতীয়াংশ বন্যার পানিতে ডুবে গিয়েছিল। এ বন্যা শহর ও গ্রামের সকল স্তরের মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। জীবন যাত্রা হয়েছে ব্যাহত। সাথে সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাসহ ব্র্যাকের কর্মসূচিও ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি, দূর্গত মানুষের সার্বিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো ছিটানো ব্র্যাকের স্থানীয় এলাকা অফিসের ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারণের জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি ত্বরিত সমীক্ষা হাতে নেয় বন্যা চলাকালিন সময়ে।

বন্যার ভয়াবহতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দূর্গত মানুষের মাঝে ব্র্যাক বিভিন্ন প্রকার রিলিফ সামগ্রী বিতরণ করে। ব্র্যাক মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে গুড়সহ হাতে বানানো আটার রুটি বন্টন শুরু করেছিল। একই সাথে ব্র্যাক বিশুদ্ধ খাবার পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, খাবার স্যালাইন, এবং বিশেষ করে ঢাকা শহরের শিশুদের জন্য দুধও বন্টন করেছে ব্যাপক হারে। বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি জেলা ও ঢাকা শহরের ৮টি থানা কে বন্যার ভয়াবহতা, ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ব্র্যাক সদস্যদের বেলায় দেখা গেছে, প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ গ্রামীণ সদস্য ও ৪৫ ভাগ শহরের সদস্যদের বসতবাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণভাবে। গ্রামীণ এলাকায় প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ সদস্যদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল (শহর এলাকায় ৬১%)। খুবই নগণ্য সংখ্যক সদস্য বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছিল।

এই দুর্দিনের মধ্যেও ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের ঋণের কিস্তি শোধ করতে হয়েছে, জমা দিতে হয়েছে সঞ্চয়ের অর্থ। কিন্তু শহরের শতকরা ১৫ ভাগ এবং গ্রামের শতকরা ৬৩ ভাগ সদস্যরা ব্যর্থ হয়েছেন সঞ্চয় জমা দিতে। শহর এলাকায়ও কিস্তি শোধের ক্ষেত্রে প্রায় একই চিত্র পাওয়া গেছে।

ব্র্যাকের কিস্তি শোধ, কিংবা সঞ্চয় জমা ও খাওয়া দাওয়া, ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম সদস্যরা নির্ভর করেছে মহাজনদের ঋণের টাকায়, আত্মীয়-স্বজনের কাছ তেখে ধার নিয়ে, কিংবা গহনা বিক্রি করে। বেঁচে থাকার জন্য সহায়-সম্পত্তি সবই বিক্রি করে অনেককেই নিঃস্ব হতে হয়েছে। দেখা গেছে, ব্র্যাক কার্যালয়ের আঙ্গিনাগুলো ১৫ দিন যাবৎ প্রায় দুই-তিন ফুট পানির নীচে ছিল যার গড় ক্ষতির পরিমাণ প্রতি

[19] "A quick assessment of flood losses and post-flood rehabilitation needs" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৮)। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উলাহ্।

অফিসে ৩০ হাজার টাকার কাছাকাছি। অধিকাংশ ব্র্যাক স্কুল বন্যার কারণে গড়ে ২৪দিন পর্যন্ত পানির নীচে থাকায় বন্ধ ছিল।

এ বন্যায় ফসলের ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে। আমন ধানের শতকরা ৬৬ ভাগ, আঁখের ৭১ ভাগ ও পাটের ৬৯ ভাগ বিনষ্ট হয়ে গেছে। কুড়িগ্রামের রৌমারী কিংবা চিলমারীতে ফসলের কোন চিহ্নই চোখে পড়েনি। সেখানকার অধিকাংশ লোকের বাড়ি, বাড়ির সকল সম্পদ, গরু ছাগল সব কিছু বানের পানিতে ভেসে গেছে। ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার ছাড়া সেখানে কোন কিছুর চিহ্ন পর্যন্ত ছিলনা।

ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের কাছে এ বন্যা ছিল এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। বন্যার পানি বাড়লে তারা বস্তির মাচা উঁচু করতে থাকে। এক পর্যায়ে যখন আবাসন পানির নীচে চলে গেল তখন বেড়িয়ে পড়ল আশ্রয়ের সন্ধানে কোন নিকটস্থ আশ্রমে। সর্বত্রই যেন বন্যার পানি ও মানুষের চোখের পানি একাকার। ঢাকা শহর তখন ভাসমান; রূপ নিল নৌকার শহরে। বিষাক্ত পোকামাকড়, সাপ, চোর, ডাকাত এবং মাস্তানদের ভয় তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখতো। সবসময় একটা ভয় ছিল পানি বাড়ছে কিনা।

পায়খানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলেই সাংঘাতিক অসুবিধার মুখোমুখী হয়েছে। অনেকেই এসব কাজ ঘরের মধ্যে করেছে। আবার কেউ পলিথিনে করে বাহিরে ফেলে দিয়েছে। এমনকি কেউ কেউ বলেছে, পানির সাথে ঘরের ভিতর মল এসেছে। চারিদিকে ময়লা আর পচা পানির গন্ধের মধ্যে মানুষ দিন যাপন করেছে। সীমাহীন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে যুবতী এবং কিশোরীরা। মাসিকের সময় তারা পরিস্কার পরিবচ্ছন্নতা রক্ষা করতে পারেনি। সবার সম্মুখে রাস্তার পাশে তাদের গোসল করতে হত। কারণ আব্রু রক্ষা করে গোসল করার মত কোন জায়গা তখন তাদের হাতের কাছে ছিলনা যেখানে তারা নির্ভয়ে যেতে পারে। লজ্জা নিবারণ তাদের কাছে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

সংসারের সব আয় বন্ধ হওয়ার কারণে পারিবারিক অশান্তি ও মহিলাদের উপর নির্যাতনের হার বেড়ে গিয়েছিল। নোংরা পানির জন্য বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। পর্যাপ্ত চিকিৎসা তাদের মেলেনি। নিতান্তই কম রিলিফ সামগ্রী তাদের কাছে পৌঁছেছে। এ সময় শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ শিশু এবং ৫৩ ভাগ মহিলা অপুষ্টিতে ভুগেছে। গর্ভবতী মায়েরা অবর্ণনীয় কষ্ট করেছে। ঘর থেকে বের হতে হলেই পানি। গলা পর্যন্ত পানিতে ভিজে তারা কিছু কিনতে যেত। দুর্বিষহ জীবন যাত্রার মধ্যে তারাও আশার আলো দেখে। তারা কাজ চায়। কাজ পেলে বেঁচে থাকতে পারবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করেই বেঁচে আছে। রিলিফ সামগ্রী যাই আসুক তারা তার সুষম বন্টন চায়। বন্যা কবলিত দরিদ্র মানুষেরা বলেন, বন্যা এ দেশে নতুন কিছু নয় – এই নিয়েই বেঁচে থাকলে হবে তাদের।

আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতিঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি বেজলাইন জরিপ[২০]

মোহাম্মদ রাফি, দেবদুলাল মলিক, ফজলুল করিম, সমীর রঞ্জন নাথ, সৈয়দ মাসুদ আহমদ, নাসিমা আকতার ও শামীম আরা বেগম

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত তের হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছোট বড় পাহাড়-পর্বতে ঘেরা একটি অঞ্চল। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত এই অঞ্চলের আয়তন বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ। তিনটি জেলায় মোট পঁচিশটি থানা আছে। এ অঞ্চলে বাঙ্গালী ছাড়াও ১৩টি উপজাতি বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাত অপর পাতায় দেয়া হল। সামাজিক চালচলন ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে এ উপজাতিগুলির মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে সাদৃশ্য থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়।

গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক দাঙ্গা হাঙ্গামা চলে আসছিল। ফলে কোন সংস্থা এ অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। শান্তি চুক্তির ফলে সম্প্রতি এ এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

অঞ্চলে দরিদ্র জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্রে ব্র্যাক পিছিয়ে নেই। গত বছরের (১৯৯৮) প্রথম দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে পাহাড়ের দরিদ্র জনগণকে আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নতি সাধনে সহায়তা প্রদান করা।

[20] "Socioeconomic and health profile of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক একটি চলমান গবেষণা কার্যক্রমের প্রাথমিক ফলাফলের ভিত্তিতে রচিত। সার-সংক্ষেপ করেছেন এ কে এম আহসান উল্লাহ্‌।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাত (১৯৯১ এর আদমশুমারী অনুসারে)

জাতিগোষ্ঠী	জনসংখ্যা
বাঙ্গালী	৪৭৩,৩০১
চাকমা	২৩৯,৪১৭
মারমা	১৪২,৩৩৪
ত্রিপুরা	৬১,১২৯
মরো	২২,১৬৭
ট্যানচংগা	১৯,২১১
বোম	৬,৯৭৮
পাংখু/পাংক্কু	৩,২২৭
চাক	২,০০০
খিয়াং	১,৯৫০
খুমী	১,২৪১
লুসাই	৬৬২
সাওতাল	২৫৩
রাখাইন	৭০
মোট	৯৭৩,৯৪০

সূত্রঃ বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস ১৯৯১, জেলা সিরিজ

সফলভাবে উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য এ এলাকার বর্তমান আর্থ-সমাজিক বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। যেমন সমাজের বর্তমান অবস্থা, সমাজের গতিশীলতা, বিভিন্ন ধরনের বিদ্যমান সমস্যা এবং তা সমাধানের কৌশল। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্মসূচির প্রয়োজনে ১৯৯৮-এ এ গবেষণা কর্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ সমীক্ষার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য রযেছে।

১। এলাকায় প্রয়োজনীয় উন্নয়ন পদক্ষেপের জন্য ব্র্যাক ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সাহায্য করা।

২। পরবর্তী সময়ে ঐ এলাকার উন্নয়নের মাত্রা পরিমাপের জন্য একটি বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ করা।

এ গবেষণার ফলাফলকে পাঁচটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন জনসংখ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবেশ বিষয়ক।

এ সমীক্ষার জন্য পাঁচটি জাতিগোষ্ঠীর (বাঙ্গালী, চাকমা, মারমা, মরো ও ত্রিপুরা) কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এজন্য নেয়া হয় ৩০টি গ্রাম থেকে মোট ৫১০টি খানা। বাঙ্গালীদের ক্ষেত্রে গড়ে ৫৪টি খানা, চাকমাদের ৫০টি, মারমা ৪২টি, ত্রিপুরা ৩৯টি ও মরোদের ১৬টি খানা নিয়ে এক একটি গ্রাম গঠিত হয়।

সমীক্ষার ফলাফলে দেখো গেছে যে, প্রাথমিক স্কুলগুলো গ্রাম থেকে গড়ে আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত, মাধ্যমিক স্কুলগুলো সাড়ে পাঁচ মাইলেরও বেশি দূরে এবং আর কলেজগুলো ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। দেখা গেছে, ৬-১০ বছর বয়স্ক বাঙ্গালী শিশুদের ভর্তির হার সবচেয়ে বেশি (৬৬%), তারপর রয়েছে চাকমা (৫৩%), মারমা (৪৫%), ও ত্রিপুরা (৩২%)। মরো শিশুদের ক্ষেত্রে এ হার সবচেয়ে কম (৪%)। সকল জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের বেলায়ই মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের স্কুলে ভর্তির হার অনেক বেশি।

অধিকাংশ খানার (৬৬%) কোন মহিলা এবং ৪৮% খানার কোন পুরুষ লেখা ও পড়া জানে না। সাক্ষরতার হার চাকমাদের সবচেয়ে বেশি (৩৮%)। তারপরেই রয়েছে মারমা (৩০%), বাঙ্গালী (২২%) এবং ত্রিপুরা। মরোদের মধ্যে মাত্র ৩% সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। আবার ১১-১২ বছর বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছেলেদের বেশি (ছেলে ৩০%, মেয়ে ৩৫%)।

এ এলাকায় খানা প্রতি জমি মরোদের সবচেয়ে বেশি (৩২০ শতাংশ), তারপরে মারমাদের (২৯৮ শতাংশ)। অপরদিকে বাঙ্গালীদের মধ্যে ভূমিতহীনের সংখ্যা বেশি (২০%)। দেখা গেছে, মরোদের প্রায় সকলেই (৯৮%), ৮০% চাকমা, ৬৮% মারমা, ৬৭% ত্রিপুরা এবং ২৭% বাঙ্গালী পরিবার জমি চাষ করেছে।

অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে বাঙ্গালীদের সঞ্চয় বেশি। চাকমা, ত্রিপুরা ও বাঙ্গালী খানায় সঞ্চয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে মুষ্টির চাল। অধিকাংশ মরো (৫৭%), ৪৯% বাঙ্গালী, ৪১% মারমা, ২৪% ত্রিপুরা, ও ১৯% চাকমা বিভিন্ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, মহাজন, ব্যবসায়ী কিংবা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে। মরো, ত্রিপুরা, ও চাকমা তাদের অধিকাংশ অর্থই খাওয়া-দাওয়ায় খরচ করেছে। অথচ বাঙ্গালীরা এই অর্থ উৎপাদনের জন্য খরচ করেছে। এ এলাকার উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে, গম, ভূট্টা, পাট, শাক-সবজি, ফল-মূল, মোরগ-মুরগী, জামা-কাপড় ও মাদক জাতীয় দ্রব্য অন্যতম। গম, ভূট্টা, পাট, শাক-সবজি, ফল-মূল, মোরগ-মুরগী, বাঁশ ও বেত বিক্রি করে তারা অর্থ উপার্জন করে। এ এলাকায় অধিকাংশ পরিবার তাদের খাদ্য চাহিদা মেটাতে পারেনা। দেখা গেছে মারমা খানার সম্পদের পমিাণ অন্যান্যদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি এবং বাঙ্গালীদের সবচেয়ে কম।

খুবই নগণ্য সংখ্যক পরিবারে নলকূপ রয়েছে। অধিকাংশ বাঙ্গালী, মারমা, চাকমা খানার এক মাইল দূরত্বের মধ্যে নলকূপ রয়েছে। তবে মাত্র ৬% মরো পরিবারের এক মাইলের মধ্যে নলকূপ রয়েছে। রান্নার জন্য বিশুদ্ধ পানি বাঙ্গালীদের চেয়ে মারমারাই বেশি ব্যবহার করে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় ১২-২৩ মাসের যে শিশুদের পূর্ণ মেয়াদে টিকা দেয়া হয়েছে তাদের হার বাঙ্গালীদের মধ্যেই বেশি (৫৪%)। এরপরে রয়েছে মারমাদের স্থান (৩৫%)। এ হার মরো শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে কম। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এ পদ্ধতি চাকমা মহিলারাই বেশি ব্যবহার করছে এবং মরোদের মধ্যে এ পদ্ধতি ব্যবহারের হার সবচেয়ে কম (৪%)।

জরিপে দেখা গেছে ৫ বছরের কম বয়সী ও ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে অসুস্থতা বেশি লক্ষণীয়। অথচ এই জাতিগোষ্ঠীদের একটি বড় অংশ অসুস্থতার সময় (১৪%) কোন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। এ এলাকায় বাঙ্গালীদের মধ্যে রাতকানা রোগের প্রাদূর্ভাব লক্ষ্য করা গেছে। তবে মরো জাতিগোষ্ঠী ছাড়া

বাকীদের অধিকাংশই ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খেয়েছে (VAC) এদের মধ্যে বাঙ্গালীদের হার সবচেয়ে বেশি (৮৬%)। বাঙ্গালীদের মধ্যে ডায়রিয়ার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

অত্র এলাকার উন্নয়নে নিবেদিত ও যোগ্য কর্মীদের নিয়োগ প্রদান করে এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু করা প্রয়োজন। যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া এলাকার জনগণ চায়না সে ধরনরে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু না করাই শ্রেয়।

নতুন বসানো টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ[21]

মোঃ যাকারিয়্যা, রিচার্ড জনস্টন ও এ এম আর চৌধুলী

ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ বিষয়টি বর্তমানে বাংলাদেশে তীব্রভাবে আলোচিত একটি বিষয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পরার পরপরই ল্যাবরেটরী এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ফিল্ডকিট দ্বারা আর্সেনিকের পরীক্ষা করে আসছে। ফিল্ডকিট হলো এমনি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নলকূপের পানিতে প্রাথমিকভাবে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। দেখা গেছে, সমগ্র বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক পরীক্ষিত নলকূপসমূহের ২৫% আর্সেনিক দূষিত। অথচ দেশের প্রায় ৯৭% জনগণই খাবার জন্য নলকূপের পানির উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ ভূগর্ভস্থ ৫০ মিটারের কম গভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকে। অচথ ইদানিং দেখা যাচ্ছে গভীর নলকূপগুলোও সম্পূর্ণ আর্সেনিক মুক্ত নয়।

ইউনিসেফের সহযোগিতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে বিশুদ্ধ খাবার পানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩,৪৪২টি নলকূপ স্থাপন করেছে। আর্সেনিক দূষণ সমস্যাকে সামনে রেখে DPHE প্রত্যেকটি নতুন নলকূপের আর্সেনিক পরীক্ষা করার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যথেষ্ট ফিল্ডকিটের সরবরাহ না থাকায় নতুন বসানো নলকূপের পানির আর্সেনিক পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ইউনিসেফ নতুন বসানো এ সমস্ত নলকূপগুলোর আর্সেনিক পরীক্ষার জন্য ব্র্যাক-কে অনুরোধ জানায়, কেননা এ বিষয়ে ব্র্যাকের রয়েছে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা।

ইউনিসেফের অনুরোধে ব্র্যাক ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ইউনিসেফ কর্তৃক স্থাপিত সমস্ত নলকূপ (সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত) পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য ১১০ জন মাঠকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। প্রশিক্ষণকালে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ৯ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছিল।

স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিক পরীক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারভাইজার দ্বারা পুনঃপরীক্ষা করা হয়। ১৭৬টি পানির নমুনা পুনঃপরীক্ষার করার জন্য ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। ল্যাবরেটরী টেস্টের ফলাফল এবং মাঠ পর্যায়ে ফিল্ডকিট দ্বারা পরীক্ষিত ফলাফলের মধ্যে উলে্লখযোগ্য কোন পার্থক্য পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষার মাধ্যমে এই উপসংহারে আসা যায় যে, মাঠকর্মীরা প্রায় ৯৪% সফলতার সাথে পানিতে আর্সেনিক পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের জন্য পানযোগ্য পানিতে আর্সেনিকের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার। ১২,৫৯৯টি নলকূপের আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষিত নলকূপসমূহের মধ্যে ১২,৭৮০টি (৯৬%) নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ছিল ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার-এর নীচে এবং ৫২১টি (৪%) নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার-এর সমান বা উপরে ছিল। পর্যবেক্ষণকালে মোট স্থাপিত নলকূপের ৪৮৪টি (৩.৬%) নলকূপ কার্যকরী ছিল না।

---

[21] "Arsenic testing of newly installed tubewells and quality control" শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন সালমা রহিম হক।

যে সমস্ত নলকূপের পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার বেশি আর্সেনিক উপস্থিত রয়েছে সেগুলোকে লাল এবং গ্রহণযোগ্য মাত্রার নীচে আর্সেনিক রয়েছে সেগুলোকে সবুজ রং দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের এক অন্যতম জাতীয় সমস্যার হচ্ছে নলকূপের পানিতে আর্সনিক দূষণ সমস্যা। এই সমস্যা দূরীকরণে আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানির বিকল্প উৎসের সর্বোত্তম ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূরীকরণে সত্ত্বর পদক্ষেপ নেয় জরুরী। সাথে সাথে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করাও জরুরী। আর্সেনিক সমস্যা সমাধানের বিকল্প পানির উৎস সৃষ্টিতে ব্র্যাক বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও ও যশোরের ঝিকরগাছা থানায় সরকার ও ইউনিসেফের সহযোগীতায় একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আশাকরা যায় এতে জনগণের গ্রহণযোগ্য পানির বিকল্প উৎস বের হয়ে আসবে।

কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি ও সংকর প্রজাতির গবাদিপশু এবং মোরগ-মুরগীর টিকার ব্যবহার সংক্রান্ত সমীক্ষা[২২]

এম এ মজিদ, টি এন নাহার, কে এম হোসেইন, এ আই তালুকদার, মাহবুব জং ফতে আলী তইমুর, বিজন কুমার শীল, আব্দুল মতিন প্রধান ও শরিফা জাহান*

ব্র্যাকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএলআরআই) সম্প্রতি দু'টো গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এর একটি ছিল গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচির উপর এবং অপরটি ছিল মোরগ-মুরগীর টিকার ব্যবহার ও তার কার্যকারিতা দেখার জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য সংগ্রহ করা হয় সরকারের সংশিষ্ট কার্যক্রম ও ব্র্যাক কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে। কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচির বিভিন্ন কৌশল ও কার্যকারিতা দেখার জন্য ব্র্যাকের খামার পর্যায়ে সংকর প্রজাতির বিভিন্ন কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মোরগ-মুরগীর টিকার ব্যবহার ও কার্যকারিতা এবং টিকাদানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণগুলা দেখার জন্য ব্র্যাকের মোরগ-মুরগী পালন কর্মসূচির অধীন ১২টি উপজেলার ৬০০টি খানা থেকে তথ্য নেয়া হয়।

কৃত্রিম প্রজনন সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, কেন্দ্রীয় প্রজনন কেন্দ্রে বীর্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সন্তোষজনক ছিল কিন্তু জেলা প্রজনন কেন্দ্রের পরীক্ষাগারে তা সন্তোষজনক ছিল না। যথাযথ উপায়ে বীর্য সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রায় অর্ধের এলাকায় বোতলে করে বীর্য সরবরাহ করা হয়েছে। কখনো তা আবার অনিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয়েছিল। বাস, রিক্সা, সাইকেল এমনকি হেঁটে গিয়েও বীর্য সরবরহ করা হয়েছে। অধিকাংশ কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্রেই বীর্য পরীক্ষা করা যায়নি কারণ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি যেমন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না, এছাড়াও বিদ্যুৎ বিভ্রাট এমনকি কিছু সামাজিক সমস্যাও ছিল।

সংকর প্রজাতির গরুগুলোর দুধউৎপাদন বিভিন্ন স্থান ও মৌসুমে বিভিন্ন রকমছিল। যেমন: যশোর, রংপুর, এবং কুমিলা এলাকার গরুগুলো বর্ষা মৌসুমে বেশি দুধ দেয়। বন্যা দূর্গত টাঙ্গাইলে এগুলো তুলনামূলক কম দুধ দেয়। আঞ্চলিক ফ্রিজিয়ান জাতের গরু বেশি দুধ উৎপাদন করে যার পরেই রয়েছে আঞ্চলিক সিন্ধি ও এল জে প্রজাতির গাভী। প্রজননের ক্ষেত্রেও ফ্রিজিয়ান প্রজাতি বেশ ভাল।

গবাদিপশু উৎপাদনকারীদের মধ্যে যারা ব্র্যাকের সদস্য তাদের চাষকৃত জমি ছিল কম, শিক্ষার হার ছিল বেশি, এ কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেশি ছিল এবং কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে তাদের সচেতনতাও ছিল বেশি। ব্র্যাকের প্রায় সকল গবাদিপশু উৎপাদনকারীই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। গবাদিপশুর যত্নও তারা বেশি নিয়েছে এবং তাতে ফলও বেশি পেয়েছে।

---

[22] "Investigation on the strategy and impact of artificial insemination programme and performance of crossbred cattle in Bangladesh" এবং "Utilization of poultry vaccine and monitoring their potency at various level in Bangladesh" শীর্ষক দু'টি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ (১৯৯৮)। সার-সংক্ষেপ করেছেন জাবীন মোহসীন সংগীতা ও এ কে এম আহসান উলাহ্।

* সকল প্রতিবেদকগণই বাংলাদেশে পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

ব্র্যাক কর্মসূচির আওতাভুক্ত অঞ্চলের উৎপাদনকারীগণ কৃত্রিম প্রজনন সম্পর্কে অনেক বিশে সচেতন। প্রায় সকলেই তাদের গবাদি পশুকে প্রজননের জন্য কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে সময়মত নিয়ে প্রজনন কার্য সম্পদান করেন।

গবাদিপশু প্রজনন সংক্রান্ত কতিপয় সুপারিশ

- প্রজনন কাজে ফ্রিজিয়ান গাভী ব্যবহার করা উচিত। জারসি প্রজাতির কার্যকারিতা দেখার জন্য আলো গবেষণার দরকার;

- বীর্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং কৃত্রিম প্রজননের জন্য ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক;

- কৃত্রিম প্রজননের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক দ্বারা নিয়মিত বীর্য পরীক্ষা করানো উচিত;

- কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে যথাযথ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা দরকার;
- সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানায়ও কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে; এবং

- প্রতি দশটি কেন্দ্রের জন্য কমপক্ষে একজন পশুসম্পদ কর্মকর্তা নিয়োগ প্রয়োজন।

মোরগ-মুরগী পালন সংক্রান্ত সমীক্ষা

বিগত দুই যুগ ধরে বাংলাদেশের আয়ের খাতে হাঁস-মুরগী পালন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারিভাবে ব্র্যাকই সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান যাদের দেশব্যাপী মোরগ-মুরগী পালন কর্মসূচি রয়েছে। ব্র্যাক প্রায় ১২ লক্ষ গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাকে এই কর্মসূচির আওতায় আনে এবং প্রায় ৩ কোটি মুরগীর বাচ্ছা বিতরণ করে। শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা কোন না কোনভাবে এই পেশায় জড়িত। গত এক যুগে দেখা গেছে যে, এ ধরনের বড় একটি কর্মসূচি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। যেমন, উৎপাদনের হার কম, মুরগীর বাচ্চা মারা যাওয়ার হার বেশি, এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই এ আক্রান্ত হওয়া।

এ সমীক্ষায় রাণীক্ষেত টিকার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়। এবং এ সমীক্ষা টিকাদান কর্মসূচির নতুন সময় নির্ধারণের পরামর্শ দেয়।

দেখা যায় Fowl pox এবং duck plague টিকাগুলোর কার্যকারিতা মানসম্মত মাত্রায় ছিল। যেহেতু বেশি সংখ্যায় মুরগীর বাচ্চা বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে তাই বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসারও প্রয়োজন পড়বে। ফলে জাতীয় টিকাদান নীতিতেও কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। বৃষ্টির সময় টিকাদান কর্মসূচি ব্যাহত হয়। ব্র্যাকের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। শীঘ্র এবং সঠিক রোগ নির্ভয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্মচারীদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

মোরগ-মুরগীর টিকাদান ও এর কার্যকারিতা বিষয়ে কিছু সুপারিশ

- বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে তাপমাত্রা ঠিক রাখা সম্ভব হয়না যা টিকার কার্যকারিতা হারানোর অন্যতম কারণ। তাই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেনারেটর ব্যবহার করা প্রয়োজন;

- মোরগ-মুরগী টিকার শিশির উপর টিকার মেয়াদকাল স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা জরুরী;

- টিকাদান প্রক্রিয়া নির্ণয় করে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ সম্পদন প্রয়োজন;

- ব্র্যাকের নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক;

- খামারের কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত করা দরকার;

- ব্র্যাকের মোরগ-মুরগী পালন কর্মসূচির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গবেষণা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা দরকার; এবং

- কর্মীদের কাছে মোরগ-মুরগীর খাদ্য সরবরাহের পূর্বেই এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নেয়া আবশ্যক।

নির্যাসের পরবর্তী খণ্ডসমূহে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ

খণ্ড ১ মার্চ ১৯৯৫

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

সাইক্লোনোত্তর পরিস্থিতি: একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশে ভূমিহীন মানুষের দৈনন্দিন জীবন

দরিদ্রদের জন্য ব্র্যাকের গৃহায়ণ কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা

গ্রাম সংগঠনগুলোকে নিয়ে ফেডারেশন গঠন: কিছু অভিমত

ব্র্যাকের প্যারালিগ্যাল কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা

আরডিপিভুক্ত গ্রাম সংগঠনের বিষয়ভিত্তিক সভা

পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: একটি কোর্সের মূল্যায়ন

মাসিক রক্তস্রাব: কিশোরী মেয়েদের বিশ্বাস ও আচরণ

ভূমিহীনদের মালিকানায় সেচ ব্যবস্থা ও সমাজে তার প্রভাব

পল্লী এলাকায় সাক্ষরতা: এনএফপিইভুক্ত কয়েকটি গ্রামের চিত্র

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি স্কুলে কেমন করছে

প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: গ্রামের একটি স্কুল সমীক্ষার ফলাফল

পল্লীর দরিদ্র মানুষের জীবনে মৎস্যচাষের প্রভাব

পল্লীর দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া

পূর্বেকার যৌথ ঋণ অনাদায়ী থাকার কারণ

বাংলাদেশে পল্লী রেশনিং ব্যবস্থা: একটি মূল্যায়ন

আইজিভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব: একটি উপজেলায় পোল্ট্রি কর্মীদের কার্যক্রমের সমীক্ষা

স্বাস্থ্য বিষয়ক

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা: শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি নিরীক্ষণ

স্বাস্থ্যসেবিকাদের কাজের একটি মূল্যায়ন

মহিলাদের গর্ভধারণ এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহার

স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে মাদার্স ক্লাবের প্রভাব

বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে ডায়রিয়ার প্রচলিত নাম

পল্লী এলাকায় চাল-লবণের তৈরী খাবার স্যালাইনের ব্যবহার

খণ্ড ২ ডিসেম্বর ১৯৯৫

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

পল্লী এলাকার কয়েকটি অবহেলিত স্কুলের উপর একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশে শিশুদের মৌলিক শিক্ষার মূল্যায়ন

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার মূল্যায়ন

এনএফপিই শিক্ষকদের ইংরেজী ও অংক বিষয়ক পারদর্শিতা এবং অন্যান্য বিষয়

দারিদ্র্য দূরীকরণে গ্রামীণ নারী: ছয়টি সমীক্ষা

আইজিভিজিডি ও ভিজিডি কর্মসূচিভুক্ত শিশু-কিশোর ও মায়েদের উপর অপুষ্টির প্রভাব

বৈবাহিক সম্পর্ক ও নারী নির্যাতন: একটি সমীক্ষা

কিশোরী মেয়েদের দৃষ্টিতে বিবাহ

গ্রামীণ মহিলাদের আয়মূলক কাজের ব্যবস্থাপনা: মির্জাপুর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা

ব্র্যাক সমিতি: সমষ্টির অংশগ্রহণ না কতিপয়ের নিয়ন্ত্রণ

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল্যায়ন

জেলে পরিবারে নারী: বাওর এলাকার চিত্র

স্বাস্থ্য বিষয়ক

স্যাটেলাইট ক্লিনিকের লক্ষ্য অর্জনে ব্র্যাকের ভূমিকা ইতিবাচক অবদান রাখবে: একটি প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য শিক্ষা কি গ্রামীণ জনসাধারণকে অধিক স্বাস্থ্য সচেতন করতে পেরেছে?

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির মৃত্যুহার কমানোর উপর ব্র্যাকের কর্মসূচির প্রভাব

বাংলাদেশের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর উপর একটি সমীক্ষা

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের উপর আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির প্রভাব

ব্র্যাকের দৈহিক বৃদ্ধি নিরীক্ষণ কর্মসূচি: একটি সমীক্ষা

খণ্ড ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

সুরুচি রেঁস্তোরার ব্যবস্থাপনা: মহিলাদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস

শিল্পউদ্যোগ সৃষ্টিতে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের ভূমিকা

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের উপর একটি জরিপ

দরিদ্রদের আইনি জ্ঞান: নির্বাচিত বেসলাইন তথ্য

ব্র্যাকের রেশম চাষ প্রকল্প: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশে জমির মালিকানা এবং ভোগ দখলের ধরন: একটি গ্রাম সমীক্ষা

মানিকগঞ্জের গিলন্ডা গ্রামে ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

মানিকগঞ্জের গুর্কি গ্রামে ব্র্যাকের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের জীবন দক্ষতার জ্ঞানের উপর কয়েকটি বাছাইকৃত আর্থ-সামাজিক উপাদানের প্রভাব: একটি বহুমুখী বিশ্লেষণ

ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে মাধ্যমিক স্কুল ছেড়ে দেয়?

স্বাস্থ্য বিষয়ক

গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবনের উপর একটি মূল্যায়ন

গর্ভবতী মহিলাদের সেবা প্রদানে ব্র্যাকের ভূমিকা

সন্তান প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী অসুস্থতা সম্পর্কে গ্রাম বাংলায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা

গ্রামের পুরুষ এবং মহিলাদের দৃষ্টিতে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা

স্বাস্থ্য ও মহিলাদের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন নির্ণয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি: একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি: প্রতিদ্বন্দ্বিতা না সহযোগিতা?

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের পুষ্টি ও দারিদ্র্য

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব

দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে নিম্ন পর্যায়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগকে বেছে নেয়াই কি উত্তম?

ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত কল্পে গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি গঠন

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ কী এ কর্মসূচির কাজকে বোঝা মনে করে?

সরকারি কর্মী, জনসাধারণ ও ব্র্যাকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উপর মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

খণ্ড ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

সম্পাদকীয়: রজত জয়ন্তী সংখ্যা

ব্র্যাক গবেষণার একুশ বছর: কিছু প্রাসংগিক কথা

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

ব্র্যাকের পাইলট সঞ্চয় প্রকল্পের উপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন

গ্রামীণ জনগণের সমস্যা মোকাবেলা ও বেঁচে থাকার কৌশল

মতলব থানায় ব্র্যাকের দু'টি স্কুলের উপর একটি সমীক্ষা

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক শিক্ষার উপর একটি সমীক্ষা

মোরগ-মুরগী পালনে ভূমিহীন দরিদ্র নারী সমাজ: পাঁচটি গ্রামের চিত্র

ব্র্যাকের মহিলা কর্মসূচি সংগঠকদের সমস্যা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের অর্থপুষ্ট প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি: মতলব এলাকার সাতটি ক্ষুদ্র ব্যবসার উপর একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের গ্রাম সংগঠনভুক্ত পাঁচ জন মহিলা সদস্যার সাফল্যের খতিয়ান

সদস্যদের গ্রাম সংগঠন ছেড়ে যাওয়ার কারণ: একটি সমীক্ষা

গ্রাম সংগঠন গঠন প্রক্রিয়ার উপর একটি পর্যবেক্ষণ

গ্রামীণ বাংলাদেশে ঋণ ব্যবস্থাপনা: জামালপুর জেলার নারায়ণপুর গ্রামের একটি চিত্র

কাজের সময়, আয় ও ব্যয়ের ঋতু ভিত্তিক তারতম্য: একটি সমীক্ষা

ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের অপ্রচলিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

মহিলা প্রধান খানায় কী কী কারণে মহিলারা ঝুঁকির সম্মুখীন হন

স্বাস্থ্য বিষয়ক

মতলব এলাকার আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উপর ব্র্যাক-আইসিডিডিআর,বি-র যৌথ গবেষণা প্রকল্পের বেজলাইন জরিপ

মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে মায়েদের ধারণা

বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের পুষ্টিহীনতা: আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

ব্র্যাকের পুষ্টি বিষয়ক কয়েকটি গবেষণার উপর একটি প্রতিবেদন

ব্র্যাকের 'ওয়াচ' প্রকল্পের স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি গবেষণা

স্বাস্থ্য সেবিকাদের মাধ্যমে গর্ভনিরোধক বিক্রয়: সমস্যা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

যৌনব্যাধি সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী সমীক্ষা: দু'টি এলাকার চিত্র

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক একটি মূল্যায়ন

খাবার স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি ও এর ব্যবহারবিধি গ্রামীণ মায়েরা কতদিন মনে রাখতে পারেন?

ব্র্যাকের মহিলা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় প্রসূতি মৃত্যুর কারণ ও এতদসংশিষ্ট বিষয়সমূহের উপর সমীক্ষা

পলী এলাকায় ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু হারে পরিবর্তন

ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি: চিকিৎসা সমাপ্তকারী রোগীদের উপর একটি সমীক্ষা

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের জ্ঞান ও তার চর্চার উপর একটি সমীক্ষা

খণ্ড ৫ নভেম্বর ১৯৯৭

সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব: একটি বিশেষ সমীক্ষা

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা: একটি সমীক্ষা

কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব: ঝিকরগাছা এলাকার চিত্র

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের ঋণদান কর্মসূচির প্রভাব: জামালপুর জেলার পাঁচটি গ্রামের চিত্র

মহিলা প্রধান খানার সমস্যাসমূহ

গ্রাম সংগঠন সদস্যদের সঞ্চয়ী অর্থের ব্যবহার

নারী পুরুষ সম্পর্কের উপর মহিলাদের মজুরীভিত্তিক কাজ ও ঋণের প্রভাব

ঋতুভেদে গ্রামীণ দরিদ্রদের খাদ্য গ্রহণের তারতম্য: একটি সমীক্ষা

লক্ষীভূত জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণে আরআরএ পদ্ধতি প্রয়োগ: লালমনিরহাট সদর থানার একটি সমীক্ষা

গ্রামীণ বাংলাদেশে শিশু শ্রম

সাক্ষরতার প্রসার: মানিকগঞ্জে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির প্রভাব

উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের আদর্শায়িত কৃতি অভীক্ষা

ছেলে ও মেয়েদের স্কুলে ভর্তি অবস্থা: প্রেক্ষিত গ্রাম বাংলা

ভর্তির প্রথম ছয় মাসের মধ্যে স্কুল ছেড়ে দেয়ার কারণ: ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর একটি সমীক্ষা

স্বাস্থ্য বিষয়ক

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে গ্রাম স্বাস্থ্য কর্মী: ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা

স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ধরন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের সমাজ

পাঁচ বছরের কম বয়সী গ্রামীণ শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির উপর একটি সমীক্ষা

মায়েদের টিকাদান সম্পর্কিত জ্ঞান গ্রামীণ এলাকায় শিশুদের টিকাদানের ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখে?

পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইজিভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব

পরিবারের আকার নির্ধারণে মতলব এলাকায় দম্পতিদের পছন্দ

জন্মশীলতা পরিবর্তনে গ্রামীণ এলাকায় ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব

কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় গর্ভনিরোধক ব্যবহারে পরিবর্তন

খণ্ড ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

সম্পাদকীয়

নির্যাস পাঠক জরিপ: মাঠ পর্যায়ের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

আর্থ-সামাজিক বিষয়ক প্রতিবেদন

ব্র্যাকের মানবাধিকার এবং আইন শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রভাব: একটি মূল্যায়ন

ব্র্যাকের কৃষি, মৎস্য, বন ও রেশম চাষ প্রকল্প: পরিবেশগত একটি সমীক্ষা

মতলব এলাকায় ১৯৯২-৯৫ এ আরডিপি'র ঋণ বিতরণের চিত্র

ব্র্যাক সদস্যদের ঋণ প্রদান, ঋণের ব্যবহার ও মুনাফা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা

আরডিপি'র মাসিক সভা: মতলবের দশটি গ্রাম সংগঠনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

পারটিসিপ্যাটরি রুরাল এ্যাপ্রাইজাল: ব্র্যাক কর্মসূচিতে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়

গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণে জটিলতা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষা সমাপনকারী ছেলে-মেয়েদের অর্জিত মৌলিক দক্ষতার মূল্যায়ন

গ্রামীণ বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও স্কুলে ভর্তির হার: ব্র্যাকের ভূমিকা

গণকেন্দ্র পাঠাগারের অবস্থা: একটি সমীক্ষা

ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক পুনর্ব্যবহার: একটি সম্ভাব্যতা যাচাই

স্বাস্থ্য বিষয়ক

জাতীয় টিকা দিবসের সংগঠন এবং বাস্তবায়ন: ১৯৯৬ পর্বের একটি মূল্যায়ন

বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে টিকাদান কর্মসূচির মূল্যায়ন

ব্র্যাকের এআরআই কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ

মহিলাদের অসুস্থতা বিষয়ক একটি সমীক্ষা

প্রজনন স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে জন্ম ও মৃত্যুর রেকর্ডকৃত কার্যাবলীর মূল্যায়ন

প্রসব-পূর্ব সেবায় কর্মসূচি সংগঠকের ভূমিকা

পরিবার পরিকল্পনা: একটি সমীক্ষা- গ্রামের মহিলাদের জন্য প্রয়োজন সঠিক ও কার্যকর ধারণা

গ্রামীণ এলাকায় প্রসব পরবর্তী সময়ে জন্মনিরোধক ব্যবহারের ধরন

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব

পুষ্টি উন্নয়নে পরিপূরক খাবার: মুক্তাগাছা পাইলট প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন

পরিপূরক খাবার সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা: মুক্তাগাছায় ব্র্যাকের একটি পাইলট সমীক্ষা

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে ল্যাট্রিন বিক্রয় কতটুকু ফলদায়ক?

অনুন্নত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুস্বাস্থ্যের ভূমিকা

ব্র্যাকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক গবেষণা (১৯৯৭-৯৮)

দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়ন: ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব মূল্যায়ন

আর্সেনিক পরীক্ষায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থ নির্গমন: একটি পরিবেশগত সমীক্ষা

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কেন্দ্র: আর্থিক সংস্থান ও ব্যয়ের প্রেক্ষিতে কার্যকারিতা